রবার্ট হুক

প্রথম অধ্যায়

কোষ ও এর গঠন (CELL AND ITS STRUCTURE)

রবার্ট ব্রাউন

ভূমিকা (Introduction) : বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে অসংখ্য প্রজাতির জীব বাস করে আর জীববিদ্যার মূল বিষয়বস্তু হলো জীবন। জীবনের পুরো তাৎপর্য বুঝতে হলে বিচিত্র জীবজগতকে জানতে হয় এবং সে জগতে বিদ্যমান শত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্রের অনুসন্ধান করতে হয়। এরূপ একটি ঐক্যসূত্র হলো কোষ (cell)।

জীবজগতের মধ্যে কারোর দেহ একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত আবার কারোর দেহ একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। বৃদ্ধি, জনন, সংবেদনে সাড়া দেওয়া, রেচন, শ্বসন প্রভৃতি নানা জৈবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদান করা প্রতিটি সজীব কোষের সাধারণ ধর্ম। এজন্য **কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও জৈবিক ক্রিয়াকলাপের একক।** এককোষী জীবেরা একটি কোষের মাধ্যমে সকল জৈবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদান করলেও বহুকোষী জীবদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোষের মধ্যে কাজের বন্টন দেখা যায়। প্রতিটি কোষ বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদান করে থাকে। জীবদেহের সকল কোষের কার্যাবলীর সম্মিলিত রূপই জীবের কাজ বা জীবনের বৈশিষ্ট্য।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে (Learning Outcome)

১। কোষ প্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেন-এর অবস্থান, রাসায়নিক গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
২। সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং বিপাকীয় ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
৩। রাইবোজোম, গলগি বস্তু, লাইসোজোম, সেন্ট্রিওলের অবস্থান, গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
৪। গঠন ও কাজের ভিত্তিতে মসৃণ ও অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
৫। মাইটোকন্ড্রিয়নের বহি :গঠন ও অন্ত :গঠনের সাথে এর কাজের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬। ক্লোরোপ্লাস্টের বহি :গঠন ও অন্ত :গঠনের সাথে এর কাজের আন্ত :সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭। নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮। নিউক্লিওপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠনের তুলনা করতে পারবে।
৯। কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারবে।
১০। জীবের বিভিন্ন কার্যক্রমে কোষের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।
১১। ক্রোমোজোমের গঠন ও এর রাসায়নিক উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।
১২। কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১৩। ডিএনএ ও আরএনএ-এর গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৪। আরএনএ-এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৫। ডিএনএ রেপ্লিকেশনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৬। ট্রান্সক্রিপশনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৭। ট্রান্সলেশন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৮। জিন ও জেনেটিক কোড বর্ণনা করতে পারবে।
১৯। বংশগতীয় বস্তু হিসেবে ডিএনএ-এর অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)

পাঠ-১ : কোষ।
পাঠ-২ : কোষের সুক্ষ্ম গঠন।
পাঠ-৩ : কোষপ্রাচীর।
পাঠ-৪ : কোষঝিল্লি।
পাঠ-৫ : সাইটোপ্লাজম ও অঙ্গাণুসমূহ।
পাঠ-৬ : রাইবোজোম।
পাঠ-৭ : গলজি বস্তু।
পাঠ-৮ : লাইসোজোম।
পাঠ-৯ : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম।
পাঠ-১০ : মাইটোকন্ড্রিয়া।
পাঠ-১১ : প্লাস্টিড।
পাঠ-১২ : সেন্ট্রিওল।
পাঠ-১৩ : পারঅক্সিসোম।
পাঠ-১৪ : নিউক্লিয়াস।
পাঠ-১৫ : ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন।
পাঠ-১৬ : ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন।
পাঠ-১৭ : কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা।
পাঠ-১৮ : DNA।
পাঠ-১৯ : RNA।
পাঠ-২০ : DNA রেপ্লিকেশন।
পাঠ-২১ : RNA-এর প্রকারভেদ।
পাঠ-২২ : ট্রান্সক্রিপশন।
পাঠ-২৩ : ট্রান্সলেশন।
পাঠ-২৪ : জিন।
পাঠ-২৫ : জেনেটিক কোড।

প্রধান শব্দ (Key words) : কোষ. কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, রাইবোজোম, গলজি বস্তু, লাইসোজোম. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, সেন্ট্রিওল, নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাস, ক্রোমোজোম, DNA, RNA, DNA রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন, জিন ও জেনেটিক কোড, সিস্ট্রন, মিউটেশন।

কোষ (Cell) : স্রষ্টার এই অপরূপ পৃথিবীতে বিরাজমান এককোষী শৈবাল হোক বা বহুকোষী বটবৃক্ষই হোক, প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট এককের সমন্বয়ে গঠিত হয়, উক্ত এককের নাম কোষ (cell)। প্রতিটি জীব তার জীবন শুরু করে একটিমাত্র কোষের মাধ্যমে। একটি মাত্র কোষের মাধ্যমে যদি কোনো জীবের গঠন ও কাজ পরিচালিত হয় তবে সেই প্রকার জীবকে এককোষী জীব বলে। অপরদিকে অধিকাংশ জীবের ক্ষেত্রে জীবের প্রথম সৃষ্ট একটিমাত্র কোষ ক্রমাগত বিভাজিত হতে থাকে, ফলে বহুকোষী জীবদেহ গঠিত হয়। তাই বলা চলে কোষ হলো জীবদেহের গঠনের একক অর্থাৎ এককোষী অথবা বহুকোষী জীব যাই হোক না কেন, কোনো জীবদেহ কোষ ছাড়া গঠিত হতে পারে না। কোষ জীবদেহের কার্য পরিচালনার একক। এই কোষে প্রতিনিয়ত বহুবিধ জৈব-রাসায়নিক (bio-chemical) ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয় বা প্রতিটি কোষই কিছু না কিছু শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে। প্রতিটি কোষ জীবন পদ্ধতির সব কাজ সম্পন্ন করে তার দেহে অবস্থিত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ।ও কোষীয় অঙ্গাণুগুলোর মাধ্যমে, তাই কোষই হলো জীবের গঠন ও কাজের মৌলিক একক (cell is a fundamental unit of structure & function of life)।

কোষের সংজ্ঞা (Definition of cell) :

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানী কোষের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন-

Jean Brachet (1963) এর মতে- কোষ হলো জীবের গঠনগত মৌলিক একক।

Loewy Siekevitz (1963) এর মতে- কোষ হলো জৈবিক ক্রিয়াকলাপের একক যা একটি অর্ধভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং যা অন্য কোনো সজীব মাধ্যম ছাড়াই আত্ম-জননে সক্ষম।

C.P. Hickman (1970) এর মতে- কোষ জৈবিক গঠন ও কাজের একক এবং এটিই নুন্যতম জৈবিক একক যা নিজের নিয়ন্ত্রণ ও প্রজননে সক্ষম।

Swanson and Webster (1978) এর মতে- কোষ হলো জীবনের ভৌত সত্ত্বার মৌলিক একক।

De Roberties (1979) এর মতে- কোষ হলো জীবের মৌলিক গঠনগত ও কার্যগত একক।

চিত্র : রবার্ট হুকের ব্যবহৃত বোতলের কর্ক

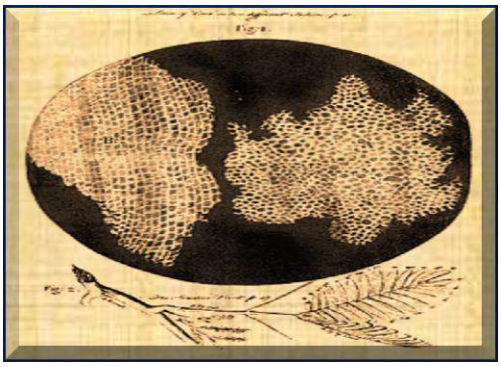
চিত্র : রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা কর্ক-এর প্রস্থচ্ছেদ

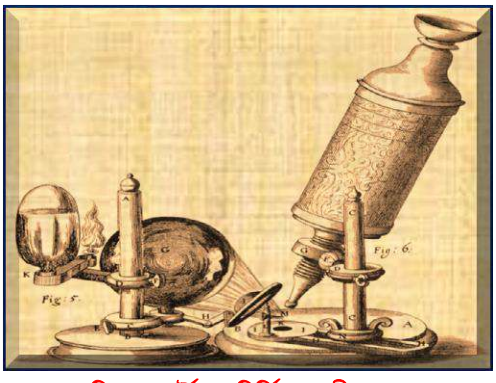
চিত্র : রবার্ট হুক নির্মিত অণুবীক্ষণযন্ত্র

কোষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of cell) :

১। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গাঠনিক ও আণবিক উপাদান কোষে থাকে।

২। প্রযোজনীয় কাঁচামাল ভেতরে গ্রহণ করতে পারে।

৩। কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে পারে এবং নিজের প্রয়োজনীয় অণুগুলোকে সংশ্লেষ করতে পারে।

৪। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

৫। পারিপার্শ্বিক যে কোনো উত্তেজনায় সাড়া প্রদান করতে পারে।

৬। একটি Homeostatic অবস্থা বজায় রাখতে পারে।

৭। কাল পরিক্রমায় অভিযোজিত হতে পারে।

৮। কোষ জিনগত তথ্য ধারন ও প্রজন্মান্তরে সঞ্চারণ করতে পারে।

৯। কোষ বিপাক (metabolism) প্রদর্শন করে।

১০. নির্দিষ্ট সময় পর কোষ মৃত্যুবরণ করে।

কোষবিদ্যা (Cytology) : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ কোষের প্রকার, অঙ্গাণুর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, বিভাজন, বিকাশ, জৈবিক কার্যাবলী, বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে কোষবিদ্যা বা সাইটোলজি (cytology) বলে। সাইটোলজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দের *kytos* (= cell, ফাঁপা) এবং *logos* (= discourse, আলোচনা) সমন্বয়ে গঠিত। Robert Hooke (1635 - 1703)-কে কোষবিদ্যার জনক বলা হয়। তবে আধুনিক কোষবিদ্যার জনক হলো Carl P. Swanson (1911 - 1996)।

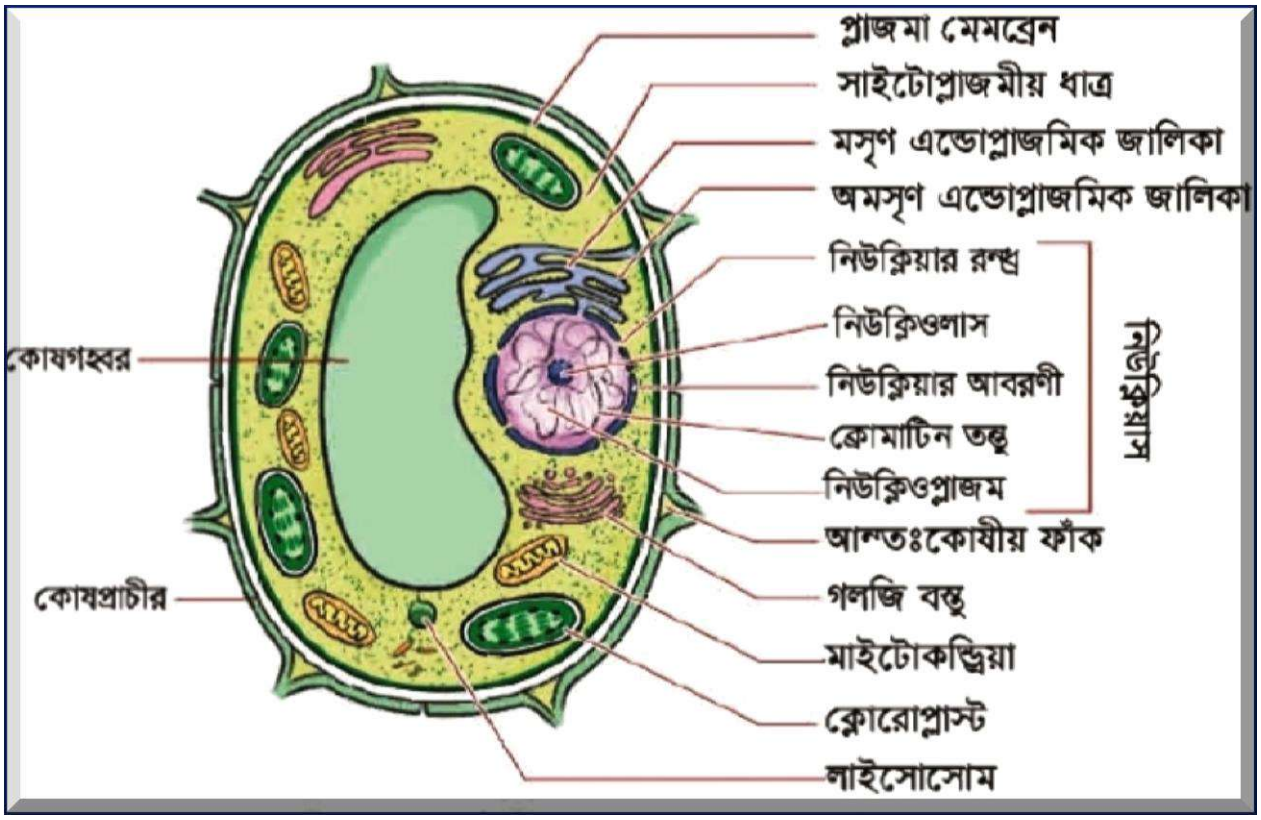

চিত্র : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ

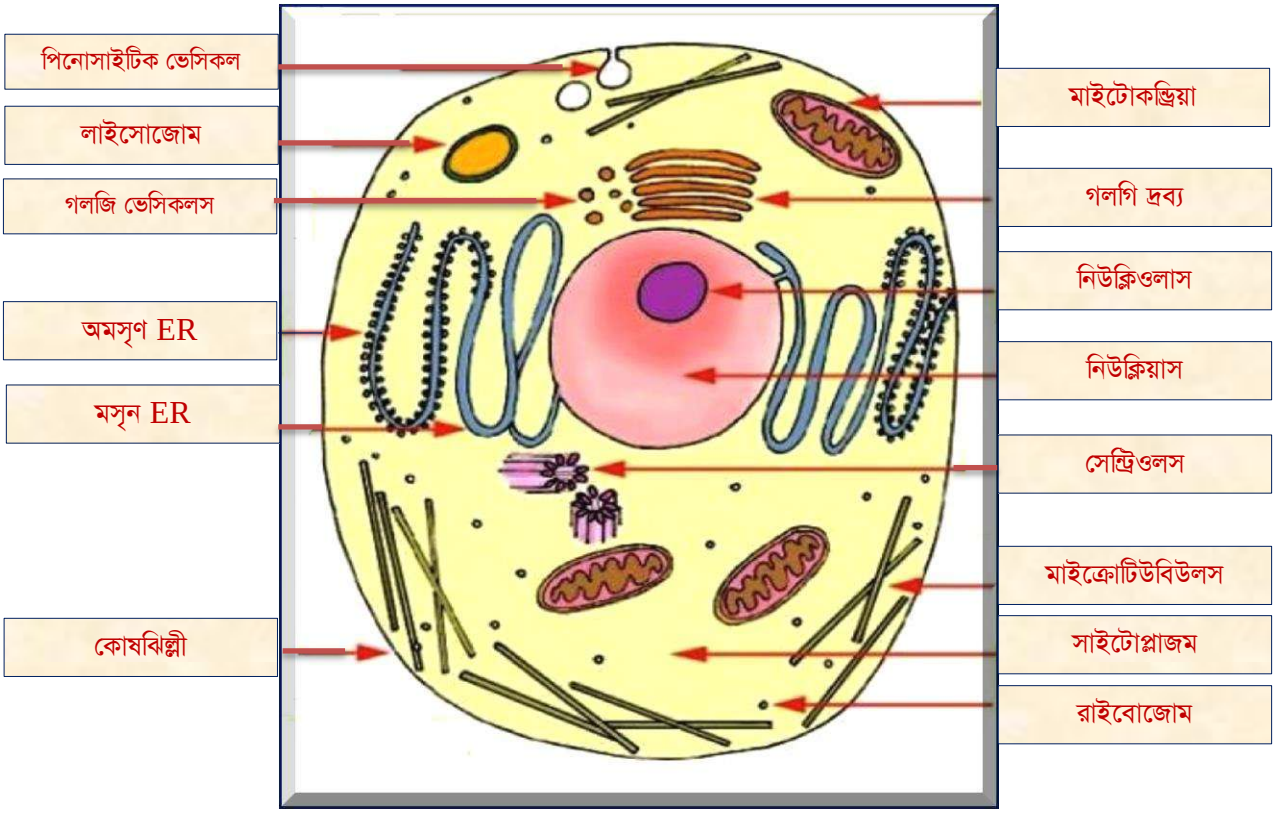

চিত্র : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃশ্যমান একটি আদর্শ প্রাণিকোষ

কোষতত্ত্ব (Cell Theory) : ১৮৩৮ সালে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী জ্যাকব শ্লেইডেন (Mathias Jacob Schleiden) ঘোষণা করেন সকল উদ্ভিদদেহ কোষ দিয়ে গঠিত। এর এক বছর পর ১৯৩৯ সালে একই দেশের প্রাণিবিজ্ঞানী থিওডোর সোয়ান (Theodor Schwann) ঘোষণা করেন প্রাণিদেহও উদ্ভিদের অনুরূপ কোষ দিয়ে গঠিত। প্রাণির ক্ষেত্রে এই সাধারণীকৃত উক্তি প্রকাশে দেরির কারণ হলো প্রাণিকোষ প্রায় অদৃশ্য প্লাজমামেমব্রেন দিয়ে আবৃত যেখানে উদ্ভিদকোষ সুস্পষ্ট প্রাচীরে পরিবেষ্টিত।

পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন যৌক্তিক ধারনার উপর ভিত্তি করে কোষ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব প্রদান করা হয়, তাকে কোষতত্ত্ব বলে।

জার্মান চিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী রুডলফ ফিরকহ (Rudolf Virchow) ১৮৫৫ সালে প্রমাণ করে বলেন কোষ হতেই কোষের উৎপত্তি ঘটে। এর ফলে কোষ সম্বন্ধে ধারনার আরও এক ধাপ অগ্রগতি হয়। আধুনিক কোষ মতবাদগুলো নিম্নলেখিতভাবে প্রকাশ করা যায়।

১। সকল জীবই কোষ সমন্বয়ে গঠিত।

২। কোষ বিভাজিত হয়েই নতুন কোষের উৎপত্তি ঘটে।

৩। কোষ অভ্যন্তরেই সকল প্রকার বিপাকীয় কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

৪। কোষ হলো জীবন্ত সত্ত্বার গাঠনিক, শারীরবৃত্তীয় এবং সাংগঠনিক একক।

৫। কোষ হলো জীবনের মৌলিক একক।

কোষের আকার, আকৃতি ও সংখ্যা (Shape, size and number of cell) : সাধারণত কোষের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। কোষ বিভিন্ন আকারের হতে পারে। কোষের আকৃতি পরিবর্তনশীল কিংবা সুস্থির বা সুস্থিত। অপরিণত কোষ সাধারণত খুব ছোট ও গোল হয়ে থাকে। কিন্তু পরিণত অবস্থায় জীবদেহে এদের অবস্থান, শারীরবৃত্তীয় কাজ এবং পরিবেশের ভিন্নতার জন্য কোষের আকারেও ব্যপক তারতম্য ঘটে। তখন কোষগুলো গোলাকার (RBC, WBC), ডিম্বাকার (প্যারেনকাইমা, চর্বিকোষ, পাখির ডিম), বর্গাকার, বহুভুজাকার (যকৃতকোষ), স্তম্ভাকার, চ্যাপ্টা (ডায়াটম), আয়তাকার, নলাকার বা মাকু আকৃতির (মসৃণ পেশীকোষ), ব্যাঙাচি আকৃতির (শুক্রাণু) ইত্যাদি হতে পারে।

Amoeba এবং লিউকোসাইট এর আকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। প্রজাতি এবং অঙ্গভেদে কোষের আকৃতি আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমনকি একই অঙ্গের কোষের মধ্যেও আকৃতিগত তারতম্য দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণির জীব, যেমন- ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও কিছু শৈবালদেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। বহুকোষী জীবদেহের আয়তনের উপর কোষ সংখ্যা নির্ভর করে। নিম্নশ্রেণির জীবদেহ কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার কোষ নিয়ে গঠিত।

কোষের জীবনকাল (Life span of cell) : প্রতিটি কোষেরই একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল (life span) আছে। কোষের জীবনকাল নির্ভর করে কোষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা (environmental condition) এবং জেনেটিক নিয়ন্ত্রণ বা জেনেটিক ঘড়ি (genetic clock) এর ওপর। যেমন- ব্যাকটেরিয়া কোষের জীবনকাল কয়েক ঘন্টা। আবার মানবদেহের কোষের গড় জীবনকাল হলো ১০ - ১২ দিন। অন্ত্রের আবরণীর কোষের জীবনকাল ২ - ৪ দিন। RBC এর ক্ষেত্রে কয়েকমাস (১২০ দিন), আর কিছু কিছু কোষের ক্ষেত্রে সারা জীবনকাল, যেমন- পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ।

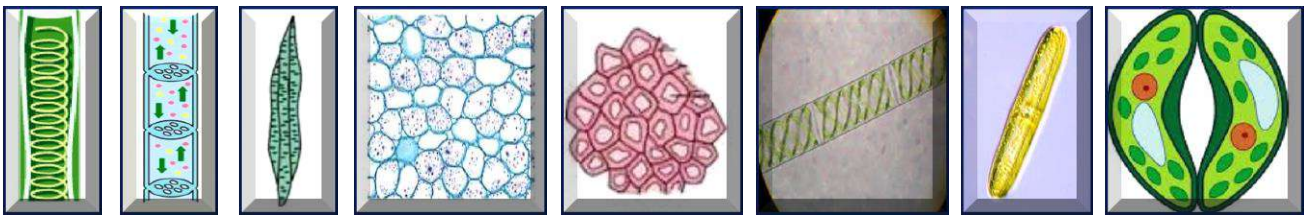

জাইলেম | ফ্লোয়েম | ট্রাকিড | প্যারেনকাইমা | স্ক্লেরেনকাইমা | স্পাইরোগাইরা | ডায়াটম | রক্ষীকোষ

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদকোষ

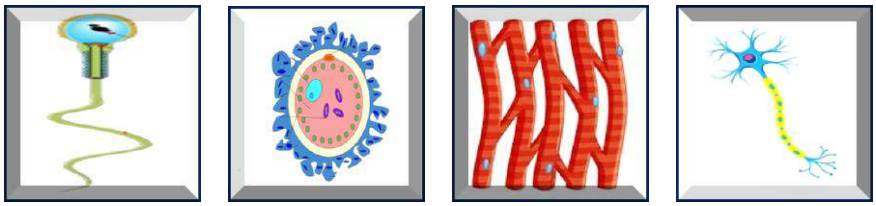

মানব শুক্রাণু | মানব ডিম্বাণু | পেশি কোষ | স্নায়ু কোষ

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের প্রাণিকোষ

কোষের প্রকারভেদ (Types of Cell) :

১. অবস্থান ও কার্যভেদে (By location and function) : অবস্থান ও কার্যভেদে বহুকোষী জীবের কোষসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- (ক) দেহকোষ (somatic cell) ও (খ) জননকোষ (reproductive cell)।

(ক) দেহকোষ (Somatic cell) : বহুকোষী জীবের যেসব কোষ শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করে কিন্তু জননে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে দেহকোষ বলে। উচ্চ শ্রেণির জীবের দেহকোষে সাধারণত ডিপ্লয়েড সংখ্যেক ক্রোমোজোম বহন করে। দেহকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সমসংখ্যেক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দেহকোষ গঠন করে। উদাহরণ- আবরণী কোষ, মূল, কাণ্ড ও পাতার কোষ ইত্যাদি।

(খ) জননকোষ (Reproductive cell) : বহুকোষী জীবের যেসব কোষ কেবলমাত্র জনন কাজে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে জননকোষ বলে। এরা দু'ধরনের হয়, যেমন- পুংগ্যামেট বা শুক্রাণু ও স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বাণু। ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ থেকে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যেক ক্রোমোজোমবাহী গ্যামেট উৎপন্ন হয়। উল্লেখ্য জনকোষ বা গ্যামেট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) যৌন জননের একক এবং রেণু বা স্পোর হলো অযৌন জননের একক।

২। নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে (Based on the structure of the nucleus) : নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে কোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) আদিকোষ (prokaryotic cell) ও (খ) প্রকৃতকোষ (eukaryotic cell) ।

(ক) আদিকোষ (Prokaryotic cell) : গ্রিকশব্দ pro অর্থ আদি এবং karyon অর্থ নিউক্লিয়াস। যে সকল কোষে আদর্শ বা সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না, ঝিল্লি যুক্ত কোষ অঙ্গাণু নেই, ক্রোমোজোম গঠিত হয় না, তাদেরকে আদিকোষ বলে। এসব কোষের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি, নিউক্লিওলাস, ক্রেমোজোম ইত্যাদি থাকে না। আদিকোষের সাইটোপ্লাজমে রাইবোজম (70S) ছাড়া অন্য কোনো কোষীয় অঙ্গাণু থাকে না এবং সাইটোপ্লাজমে শুধুমাত্র বৃত্তাকার DNA মুক্তভাবে ছড়ানো থাকে, যা নিউক্লিওয়েড (nucleoid = nucleus like) নামে পরিচিত। এদের কোষ বিভাজন পদ্ধতি অ্যামাইটোসিস। যেমন- মাইকোপ্লাজমা, ব্যাকটেরিয়া এবং সায়ানোব্যাকটেরিয়া।

(খ) প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) : গ্রিকশব্দ Eu অর্থ আদর্শ বা প্রকৃত এবং Karyon অর্থ নিউক্লিয়াস। যে সকল কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে, ঝিল্লিযুক্ত কোষ অঙ্গাণু বিদ্যমান, ক্রোমোজোম ক্ষারীয় প্রোটিন যুক্ত, তাদেরকে প্রকৃত কোষ বলে। এসব কোষের ক্রোমোজোম আদর্শ প্রকৃতির এবং নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত DNA হিস্টোন প্রোটিন যুক্ত। এদের মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের DNA চক্রাকার, কোষপ্রাচীর সেলুলোজ যুক্ত এবং রাইবোজোম 80S প্রকৃতির। ট্রান্সক্রিপশন নিউক্লিয়াসে ঘটে। সকল যৌন জননকারী জীবে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশা বিদ্যমান। কোষ বিভাজন মাইটোসিস ও মিয়োসিস প্রকৃতির এবং বিভাজনকালে মাকুতন্ত্র গঠিত হয়। বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা ইত্যাদি সকল উন্নত উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহ প্রকৃতকোষ দিয়ে গঠিত।

৩। জীবদেহ গঠনের ভিত্তিতে (On the basis of the formation of host) : জীবদেহ গঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই প্রকার। যথা- (ক) উদ্ভিদকোষ (plant cell) ও (খ) প্রাণিকোষ (animal cell)।

(ক) উদ্ভিদকোষ (Plant cell) : উদ্ভিদদেহ গঠনকারী, জঠিল কোষ প্রাচীর বিশিষ্ট, প্লাস্টিড নামক কোষীয় অঙ্গাণু দিয়ে গঠিত কোষকে উদ্ভিদকোষ বলে। আদর্শ উদ্ভিদকোষে সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর ও প্লাস্টিড নামক অঙ্গাণু বিদ্যমান। এদের সঞ্চিত খাদ্য সাধারণত শ্বেতসার। এতে মাইটোকন্ড্রিয়া কম ও সাধারণত সেন্ট্রিওল থাকে না। এদের পরিণত কোষের গঠন ডিম্বাকার, গোলাকার, আয়তাকার ইত্যাদি প্রকার হয়ে থাকে।

(খ) প্রাণিকোষ (Animal cell) : প্রাণিদেহ গঠনকারী, কোষপ্রাচীর ও বর্ণকণিকা বিহীন কোষকে প্রাণিকোষ বলে। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর ও প্লাস্টিড নামক কোষ অঙ্গাণু থাকে না। এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী এবং সাধারণত সবকোষে সেন্ট্রিওল থাকে। সঞ্চিত খাদ্য ।মুখ্যত গ্লাইকোজেন ও চর্বি এবং কোষ গহবর ক্ষুদ্র প্রকৃতির।

৪। ক্রোমোজোমের সংখ্যার ভিত্তিতে (On the basis of the number of chromosomes) : ক্রোমোজোমের সংখ্যার ভিত্তিতে কোষ দু'প্রকার, যথা- (ক) হ্যাপ্লয়েড কোষ (haploid cell) ও (খ) ডিপ্লয়েড কোষ (diploid cell)।

(ক) হ্যাপ্লয়েড কোষ (Haploid cell) : হ্যাপ্লয়েড সংখ্যেক (n) ক্রোমোজোমবাহী কোষকে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলে। এসব কোষের নিউক্লিয়াসে এক সেট ক্রোমোজোম থাকে। প্রতি সেট ক্রোমোজোমকে জিনোম বলে। যেমন- জনন কোষ বা গ্যামেট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু), এছাড়াও জীবজগতে কতিপয় স্পোরোজোয়া, অধিকাংশ শৈবাল ও ছত্রাক এবং সকল ব্রায়োফাইটস।

(খ) ডিপ্লয়েড কোষ (Diploid cell) : ডিপ্লয়েড সংখ্যেক (2n) ক্রোমোজোমবাহী কোষকে ডিপ্লয়েড কোষ বলে। এসব কোষের নিউক্লিয়াসে দুই সেট ক্রোমোজোম থাকে। যেমন- উচ্চ শ্রেণির জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণি) দেহকোষ।

আদিকোষ ও প্রকৃতকোষের মধ্যে পার্থক্য (Difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells) :

পার্থক্যের বিষয়	আদিকোষ (Prokaryotic cells)	প্রকৃতকোষ (Eukaryotic cells)
১। গঠন	সাধারনত এককোষী এবং সরল প্রকৃতির।	এককোষী থেকে বহুকোষী এবং জঠিল প্রকৃতির।
২। কোষপ্রাচীর	কোষপ্রাচীর থাকে।	উদ্ভিদকোষে থাকে কিন্তু প্রাণিকোষে থাকে না।
৩। আকার	তুলনামূলক ক্ষুদ্র।	তুলনামূলক বৃহৎ।
৪। নিউক্লিয়াস	সুগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত।	সুগঠিত নিউক্লিয়াস উপস্থিত।
৫। নিউক্লিয় বস্তু	DNA দ্বারা গঠিত।	ক্রোমোজোম দ্বারা গঠিত।
৬। কোষীয় অঙ্গাণু	রাইবোসোম ছাড়া অন্য কোন কোষীয় অঙ্গাণু থাকে না।	সকল কোষীয় অঙ্গাণূ বিদ্যমান।
৭। রাইবোসোম	70S প্রকৃতির।	80S প্রকৃতির।
৮। কোষ বিভাজন	আমাইটোসিস বা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে ঘটে।	মাইটোসিস ও মিয়োসিস পদ্ধতিতে ঘটে।
৯। ট্রান্সক্রিপশন	সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়।	নিউক্লিয়াসে সংঘটিত হয়।
১০। সেন্ট্রিওল	সাধারণত থাকে না।	প্রাণিকোষে থাকে।

দেহকোষ ও জননকোষের মধ্যে পার্থক্য (Differences between somatic cells and reproductive cells) :

পার্থক্যের বিষয়	দেহকোষ (Somatic cells)	জননকোষ (Reproductive cells)
১। ধরন	কেবলমাত্র দেহ গঠনে অংশগ্রহণ করে।	কেকেবলমাত্র জননকোষ গঠনে অংশগ্রহণ করে।
২। প্রকৃতি	ক্রোমোজোম ডিপ্লয়েড (2n) প্রকৃতির হয়।	ক্রোমোজোম হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়।
৩। উৎপত্তি	পূবর্তন দেহ মাতৃকোষ থেকে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় নতুন দেহকোষ উৎপন্ন হয়।	জনন মাতৃকোষ থেকে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে জননকোষ উৎপন্ন হয়।
৪। প্রকারভেদ	দেহকোষ বিভিন্ন ধরনের হয়।	জননকোষ দু'ধরনের-শুক্রাণু ও ডিম্বাণু।
৫। জাইগোট গঠন	এদের মিলন ঘটে না।	এরা জাইগোট গঠন করে।
৬। তারতম্য	পুরুষ বা স্ত্রী দেহকোষের তারতম্য নেই।	পুরুষ ও স্ত্রীদেহ ভিন্ন ধরনের।
৭। বংশগতি	দেহকোষ দ্বারা বংশগতির তথ্যের স্থানান্তর ঘটে না।	জননকোষ দ্বারা বংশগতির তথ্যের স্থানান্তর ঘটে।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে পার্থক্য (Differences between plant cells and animal cells) :

পার্থক্যের বিষয়	উদ্ভিদকোষ (Plant cells)	প্রাণিকোষ (Animal cells)
১। কোষপ্রাচীর	সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর থাকে।	কোষপ্রাচীর থাকে না।
২। প্লাস্টিড	থাকে (ব্যতিক্রম-ছত্রাক)।	থাকে না।
৩। মাইক্রোভিলাই	থাকে না।	থাকে।
৪। সেন্ট্রোজোম	থাকে না।	থাকে।
৫। ভ্যাকুওল	পরিণত কোষে একটি বা দুটি বড় আকৃতির।	সংখ্যায় অনেক কম ও ছোট আকৃতির।
৬। লাইসোজোম	থাকে না।	থাকে।
৭। প্লাজমোডেজমাটা	গঠিত হয়।	গঠিত হয় না।
৮। পিনোসাইটিক গহবর	গঠিত হয় না।	গঠিত হয়।

কোষপ্রাচীর (Cell wall) : জননকোষ ছাড়া উদ্ভিদকোষের প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে প্রোটোপ্লাজম নি :সৃত সেলুলোজ নামক নির্জীব স্তরের অপেক্ষাকৃত পুরু, দৃঢ়, জড়, স্থিতিস্থাপক, রক্ষণ কাজের সাথে যুক্ত আবরণকে কোষ প্রাচীর বলে।

কোষ প্রাচীর উদ্ভিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রাণিকোষে এটি অনুপস্থিত। ১৬৬৫ সালে রবার্ট হুক নিজের তৈরি অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে বোতলের কর্ক পরীক্ষাকালে যে প্রকোষ্ট দেখেছিলেন তা ছিল মুলত কোষ প্রাচীর। কোষের অবস্থান, বয়স, কাজের ভিত্তিতে কোষপ্রচীরের পুরুত্ব, গঠন ও রাসায়নিক চরিত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কোষের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সেলুলোজের উপরিভাগে লিগনিন জমা হয়ে কোষ প্রাচীর সুক্ষ্ম অথবা স্থুল এবং মসৃণ বা কারুকার্যময় হতে পারে। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও গলজি বস্তু নামক অঙ্গাণু কোষপ্রাচীর গঠনে সহায়তা করে। সাইটোকাইনেসিসের সময় কোষপ্রাচীর গঠিত হয়।

ভৌত গঠন (Physical structure) : গঠন ও পরিস্ফুটনের ভিত্তিতে উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখা যায়, যথা- মধ্যপর্দা, প্রাথমিক কোষ প্রাচীর ও গৌণ কোষ প্রাচীর। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো-

মধ্যপর্দা (Middle lamella) : কোষপ্রচীরের যে স্তরটি দুটি পাশাপাশি কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ পর্দা হিসেবে অবস্থান করে তাকে মধ্যপর্দা বা মধ্য ল্যামেলা বলে। কোষের ভৌত গঠনের প্রথম অংশটি হলো মধ্যপর্দা, মাইটোটিক কোষ বিভাজনের টেলোফেজ দশায় এর সূচনা ঘটে। সাইটোপ্লাজম থেকে আসা ফ্রাগমোপ্লাস্ট (fragmoplast) এবং গলগি বডি থেকে আসা পেকটিন জাতীয় ভেসিকলস মিলিতভাবে মধ্যপর্দা সৃষ্টি করে। এরা পাশাপাশি দুটি কোষকে সিমেন্টের মতো ধরে রাখে। এটি বিগলিত হলে দুটি কোষ পৃথক হয়ে যায়।

প্রাথমিক কোষ প্রাচীর (Primary cell wall) : মধ্যপর্দার উভয়পাশে অবস্থিত, প্রধানত সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীরের প্রথম যে প্রাচীর গঠিত হয় তাকে প্রাথমিক কোষ প্রাচীর বলে। মধ্যপর্দার ওপর সেলুলোজ (cellulose), হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) এবং গ্লাইকোপ্রোটিন (glycoprotein) ইত্যাদি জমা হয়ে একটি পাতলা স্তর (১ μm – ৩ μm) তৈরি করে। কোষের কুপ এলাকায় এ প্রাচীর সৃষ্টি হয় না। সব কোষেই প্রাথমিক প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এটি কুপবিহীন, স্থিতিস্থাপক, বৃদ্ধিতে সক্ষম এবং প্রধানত মাইক্রোফাইব্রিল দিয়ে গঠিত।

গৌন কোষ প্রাচীর (Secondary cell wall) : প্রাথমিক প্রাচীরের উপর স্তরে সেলুলোজ জমা হয়ে যে স্তর সৃষ্টি করে তাকে গৌণ কোষ প্রাচীর বলে। কোষের পরিনত অবস্থায় এর উৎপত্তি ঘটে। এ স্তরটি বেশ পুরু (৫ μm – ১০ μm) ও তিনস্তর বিশিষ্ট। যথা- আংশিক পাতলা বহি :স্তর, কিছুটা পুরু মধ্যস্তর এবং অধিক পাতলা অন্ত :স্তর। যে সব কোষে বেশী বিপাকীয় কাজ চলে (যেমন- ভাজক কোষ) সেসব কোষে গৌণ প্রাচীর গঠিত হয় না। কেবল স্থায়ী কোষে (ভেসেল, ট্রাকিড, ফাইবার) এ প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এ ধরনের প্রাচীর পানি ও গ্যাস অভেদ্য।

কুপ এলাকা (Pit fields) : কোষপ্রাচীরের মধ্যপর্দার উপর মাঝে মাঝে প্রাথমিক প্রাচীর সৃষ্টি না হওয়ায় সরু ও নলাকার গর্তের সুষ্টি হয়। এমন গর্তগুলোকে পিট (pit) বা কুপ বলে। এটি হলো প্রাচীরের সবচেয়ে পাতলা এলাকা। ২টি পিট পাশাপাশি থাকলে তাদের একত্রে পিট জোড় (pit pair) বলে। আর পিট জোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মধ্যপর্দাকে পিট মেমব্রেন (pit membrane) বলে। আসলে কুপ অঞ্চলে প্রাথমিক প্রাচীর গঠিত হয় না। গৌণ প্রাচীরে তৈরি হলে কুপ পাড়হীন অথবা পাড়যুক্ত (bordered pit) হতে পারে। দুটি পাশাপাশি কোষের প্রাচীরের সুক্ষ্ম ছিদ্র পথে নলাকার সইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হয়। একে প্লাজমোডেসমাটা বলে।

রাসায়নিক গঠন (Chemical structure) : কোষপ্রাচীরের প্রধান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ (cellulose) নামক একটি নিষ্ক্রিয় পলিস্যাকারাইড। এর মধ্যপর্দা পেকটিক এসিড, পেকটিন ও প্রোপেকটিন দ্বারা গঠিত হলেও অধিক পরিমানে পেকটিক এসিড থাকে। প্রাথমিক কোষপ্রাচীর (1 μm – 3 μm) সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, গ্লাইকোপ্রোটিন এবং কিছু পেকটিক এসিড দ্বারা গঠিত। গৌণ কোষপ্রাচীর (5 μm – 10 μm) প্রধানত সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজের বিভিন্ন মাত্রার মিশ্রণ দ্বারা গঠিত। তবে এর সাথে লিগনিন, সুবেরিন, মোম ও চর্বি জমা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীরে কিউটিন জমা হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভিদে সিলিকেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট সঞ্চিত হতে দেখা যায়। ছত্রাকের প্রাচীরে কাইটিন এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীর লিপিড-প্রোটিন পলিমার দিয়ে গঠিত। সাধারণত কোষপ্রাচীরে ৪০% সেলুলোজ, ২০% হেমিসেলুলোজ, ৩০% পেকটিন এবং ১০% গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে।

* উন্নত উদ্ভিদের বায়বীয় অংশের কোষের কোষপ্রাচীরে অবস্থিত চর্বি জাতীয় পদার্থ সুবেরিন ও কিউটিন পানি নিরোধক পদার্থরূপে কাজ করে এবং ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

* পাতার আবরণী কোষের কোষপ্রাচীরে কিউটিন থাকে যা বাস্পমোচনের হার কমায়।

* ফল ও বীজের কোষপ্রাচীরে গাম ও মিউসিলেজ জাতীয় পদার্থ থাকে।

* কাষ্ঠল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদের গৌণ কোষপ্রাচীরের লিগনিন কোষপ্রাচীরকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

কোষপ্রাচীরের কাজ (Function of cell wall) :

১। কোষের সুনির্দিষ্ট আকৃতি দান করা।
২। বাইরের আঘাত হতে ভেতরের সজীব বস্তুকে রক্ষা করা।
৩। প্রয়োজনীয় শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করা।
৪। পানি ও খনিজ লবন শোষণ ও পরিবহনে সহায়তা করা।
৫। এক কোষ হতে অন্য কোষকে পৃথক করা।
৬। প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে কোষগুলোর সজীব প্রোটোপ্লাজমের সাথে সংযোগ রক্ষা করা।
৭। কোষপ্রাচীরে অবস্থিত কিউটিন, সুবেরিন, মোম প্রভৃতি পানি নিরোধক রূপে কাজ করে।
৮। উদ্ভিদদেহে রোগজীবাণু অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করে।
৯। কোষের অভিস্রবনিক চাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
১০। কোনো কোনো উদ্ভিদে বাস্পমোচন রোধে সহায়তা করে।
১১। কোনো কোনো কোষে এটি বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করে।

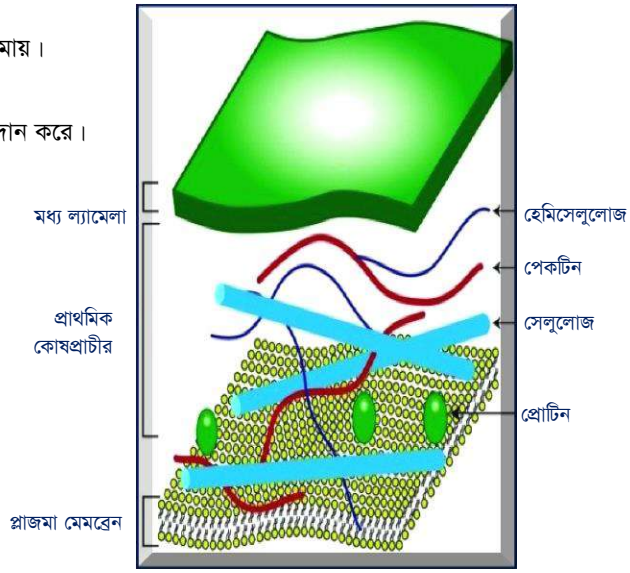

চিত্র : কোষ প্রাচীরের গঠন

প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast) : কোষপ্রাচীর দ্বারা পরিবেস্টিত কোষের সমুদয় সজীব ও নির্জীব পদার্থকে একত্রে প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast) বলে। অর্থাৎ কোষপ্রাচীর ব্যতিত অন্য সকল অংশকে প্রোটোপ্লাস্ট বলে। প্রোটোপ্লাস্ট দুটি অংশে বিভক্ত, যথা- সজীব প্রোটোপ্লাজম এবং নির্জীব বস্তু বা অপ্রোটোপ্লাজমীয় উপাদান। ১৮৮০ সালে Hanstein সর্বপ্রথম প্রোটোপ্লাস্ট শব্দটি ব্যবহার করেন। পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণাগারে যেসব প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি করা হয় তাদের আইসোলেটেড প্রোটোপ্লাস্ট (isolated protoplast) বলে।

প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) : কোষঝিল্লী দ্বারা পরিবেষ্টিত কোষাভ্যন্তরের সজীব, ঈষদচ্ছ, দানাদার, কোলয়েডধর্মী, বর্ণহীন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম (Gr. *Protos* = first + *plasma* = anything formed) বলে। প্রাণির ভ্রূণের ভেতরের বস্তুর বর্ণনা করতে চেক বিজ্ঞানী পারকেনজি (Jan E Purkinje) ১৮৪০ সালে সর্বপ্রথম Protoplasm শব্দটি ব্যবহার করেন। ইংরেজ জীববিজ্ঞানী থমাস হাক্সলি (Thomas Huxley, 1868) প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি (physical basis of life) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। জীবের সকল কার্যাবলী এর দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি বা *vivum fluidum* বলা হয়। কোষের মূল উপাদান এবং ধাত্র (matrix) পদার্থ হলো প্রোটোপ্লাজম। এতে ৭০% - ৯০% পানি থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় কেন পানির অপর নাম জীবন। এর মধ্যেই নিউক্লিয়াস, কোষীয় সকল অঙ্গাণু ও বস্তুসমূহ ডুবানো থাকে।নিউক্লিয়াস ব্যতিত প্রোটোপ্লাজমকে সাইটোপ্লাজম (cytoplasm) বা সাইটোসল (cytosol) বলে। আমেরিকান প্রাণিবিজ্ঞানী এডমন্ড বি উইলসন (Edmund B. Wilson) এর মতে প্রোটোপ্লাজম কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি মাত্র।

প্রোটোপ্লাজমের ভৌত বৈশিষ্ট্য (Physical characteristics of protoplasm) : ১। প্রোটোপ্লাজম ঈষৎ স্বচ্ছ, বর্ণ ও গন্ধহীন, জেলির ন্যায় অর্ধতরল পদার্থ। ২। এটি কলয়েডধর্মী ও দানাদার। ৩। ইহা কোষস্থ পরিবেশ অনুযায়ী জেলি থেকে তরলে এবং তরল থেকে জেলিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ৪। পানি অপেক্ষা প্রোটোপ্লাজমের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি। ৫। প্রোটোপ্লাজম উত্তাপ, এসিড ও অ্যালকোহলের প্রভাবে জমাট বাuধে। ৬। এর ঘনত্ব পরিবর্তনশীল।

প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য (Chemical characteristics of protoplasm) : ১। প্রোটোপ্লাজমের শুস্ক গঠনে অনেক জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে। শুষ্ক প্রোটোপ্লাজমের ৪৫% প্রোটিন, ২৫% লিপিড, ২৫% কার্বোহাইড্রেট এবং ৫% অন্যান্য বস্তু বিদ্যমান থাকে। ২। এতে পানির (৭০-৯০%) পরিমাণ অধিক। ৩। প্রোটোপ্লাজমের জৈব পদার্থের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন ও অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ। ৪। প্রোটোপ্লাজমে অল্প পরিমাণ তরল চর্বি ও তৈল থাকে। ৫। প্রোটোপ্লাজমে খনিজ পদার্থ হিসেবে ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও আয়রনের বিভিন্ন লবন।

প্রোটোপ্লাজমের জৈবিক বৈশিষ্ট্য (Biological characteristics of protoplasm) : ১। প্রোটোপ্লাজম নানা ধরনের উত্তেজনায় সাড়া দিতে সক্ষম। তাপ, আলো, স্পর্শ, বৈদ্যুতিক আঘাত ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে স্পষ্টভাবে সাড়া দেয়। ২। প্রোটোপ্লাজমে শ্বসন, খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি জৈবনিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। ৩। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। ৪। এতে নানা ধরনের চলন দেখা যায়। ৫। প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ এটি নশ্বর।

প্রোটোপ্লাজমের চলন (Movement of Protoplasm) : প্রোটোপ্লাজম কখনো স্থির থাকে না। প্রোটোপ্লাজমের এ গতিময়তাকে চলন (movement) বলে। কোষ প্রাচীরযুক্ত ও কোষ প্রাচীরবিহীন প্রোটোপ্লাজমের চরনে ভিন্নতা দেখা যায়। কোষ প্রাচীরযুক্ত প্রোটোপ্লাজমে জলস্রোতের মতো যে চলন দেখা যায় তাকে আবর্তন বা সাইক্লোসিস (cyclosis) বলে। আবর্তন আবার দুধরনের হয়ে থাকে।

১। একমুখী আবর্তন (One-way rotation) : যে চলনে প্রোটোপ্লাজম একটি গহবরকে কেন্দ্র করে কোষপ্রাচীরের পাশ দিয়ে নির্দিষ্ট পথে একদিকে ঘুরতে থাকে তাকে একমুখী আবর্তন (one-way rotation) বলে। যেমন- পাতা ঝাuঝির কোসস্থ প্রোটোপ্লাজমের চলন।

২। বহুমুখী আবর্তন (Versatile rotation) : যে চলনে প্রোটোপ্লাজম কতগুলো গহবরকে কেন্দ্র করে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন দিকে ঘুরতে তাকে তাকে বহুমুখী আবর্তন (versatile rotation) বলে। যেমন (*Tradescantia*)-র কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের চলন।

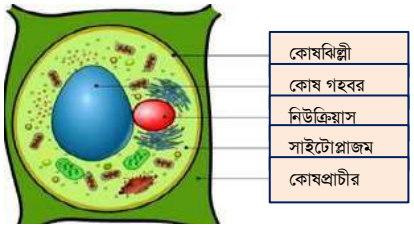

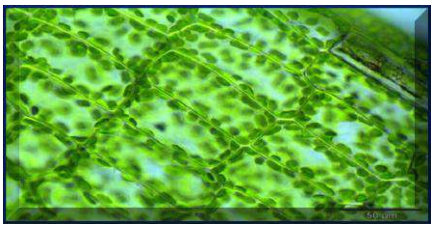
চিত্র : একমুখী আবর্তন

চিত্র : বহুমুখী আবর্তন

প্রোটোপ্লাজমের কাজ (Function of protoplasm) :

১। প্রোটোপ্লাজম জীবনের পদার্থিক ভিত্তি স্বরূপ।
২। এটি কোষের মূল উপাদান, এর মধ্যে কোষের সকল অঙ্গাণু, নিউক্লিয়াস ও অঙ্গাণুসমূহ অবস্থান করে।
৩। এর প্রধান কাজ হলো বংশবিস্তার করা যা জীবনের নিরবচ্ছিন্নতার জন্য একটি অন্যান্য জৈবনিক প্রক্রিয়া।
৪। প্রোটোপ্লাজমে বিদ্যমান প্রোটিন জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়, শর্করা ও লিপিড দেহে শক্তি যোগান দেয়।
৫। এতে বিদ্যমান বিভিন্ন খনিজলবন কোষের অভিস্রবণিক চাপ, তরল পদার্থের ঘনমাত্রা এবং নানা প্রকার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় আয়নিক ভারসাম্য রক্ষা করে।
৬। প্রোটোপ্লাজমের পানি জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য।

কোষঝিল্লি (Plasma Membrane) : কোষ প্রাচীরের ঠিক নিচে সমস্ত প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি সজীব ঝিল্লি আছে। এ ঝিল্লিকে কোষঝিল্লি বলে। অন্যভাবে, প্রতিটি সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজম যে সুক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক, বৈষম্যভেদ্য লিপো-প্রোটিন দ্বারা গঠিত সজীব দ্বিস্তরী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে, তাকে কোষঝিল্লি বা প্লাজমামেমব্রেন বলে।

বিভিন্ন অঙ্গাণুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, বিভিন্ন পদার্থের আদান-প্রদানসহ আন্ত :কোষীয় সংযোগ রক্ষার জন্য স্থানভেদে এই পর্দার গাঠনিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কার্ল নাগেলি (Cardl Nageli - 1855) সর্বপ্রথম এই ঝিল্লিকে প্লাজমামেমব্রেন নামকরণ করেন। তবে বর্তমানে অনেকেই একে বায়োমেমব্রেন (biomembrane) বলতে চান। J.O. Plower (1931) প্লাজমালেমা শব্দটি ব্যবহার করেন। প্লাজমামেমব্রেন প্রধানত লিপিড ও প্রোটিনে গঠিত। এর গঠন বিন্যাস বর্ণনা করার জন্য বিজ্ঞানীগন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। অধিকাংশ কোষবিজ্ঞানীর মতে লিপিড-এর অণুগুলো দুটি স্তরে বিন্যস্ত হয়ে প্লাজমামেমব্রেনের কাঠামো গঠন করে। দ্বিস্তরী লিপিড কাঠামোর মধ্যে প্রোটিন অণুগুলো দ্রবীভূত হয়ে অবস্থান করে।

কোষ ঝিল্লির অবস্থান (Plasma membrane location) : কোষ প্রাচীর থেকে ভেতরের দিকে কোষ প্রাচীরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ আবরণটিকে এবং প্রাণিকোষের বহি :স্থ আবরণটিকে কোষ ঝিল্লি বলে। একে প্লাজমালেমা, সাইটোমেমব্রেন এসব নামেও অভিহিত করা হয়।

কোষ ঝিল্লির উৎপত্তি (Origin of plasma membrane) : সাইটোপ্লাজমের বহি :স্তর পরিবর্তিত হয়ে কোষঝিল্লি গঠন করে। ঝিল্লিটি স্থানে স্থানে ভাঁজবিশিষ্ট হতে পারে। প্রতিটি ভাঁজকে মাইক্রোভিলাস (বহুবচনে মাইক্রোভিলাই) বলে। কোষাভ্যন্তরে অধিক প্রবিষ্ট মাইক্রোভিলাসকে বলা হয় পিনোসাইটিক ফোস্কা।

ভৌত ও রাসায়নিক গঠন (Physical and chemical composition) : কোষঝিল্লি অত্যন্ত পাতলা যা ৭০-১০০Å পুরু। এটি দু'স্তরবিশিষ্ট এবং স্থানে স্থানে তা বিছিন্ন। এ দু'টি স্তরের মাঝে প্রায় ১০০Å পুরু একটি ফাঁকা স্থান রয়েছে। লিপিড হলো কোষঝিল্লির অন্যতম রাসায়নিক উপাদান (৬০%) আর অপর প্রধান উপাদান প্রোটিন (৪০%)। এজন্য একত্রে লিপোপ্রোটিন বলে। তবে বিভিন্ন কোষে লিপিড ও প্রোটিনের অনুপাতের মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রোটিনের অণূ গাঠনিক উপাদান, এনজাইম বা বাহক হিসেবে থাকে। এছাড়া সামান্য পরিমান (১ - ৪%) অন্যান্য উপাদান থাকে, যেমন- কার্বোহাইড্রেট, লেসিথিন, বিভিন্ন এনজাইম, RNA ইত্যাদি থাকে। এছাড়া সেখানে পানি ও লবন থাকে।

প্লাজমামেমব্রেন একটি গতিশীল অর্ধতরল গঠন। এরা লিপিড ও প্রোটিন সঞ্চারণে সক্ষম। প্লাজমামেমব্রেনের গঠন শৈলী বর্ণনায় সকল কোষবিজ্ঞানীই দ্বিস্তরী লিপিড-এর কথা বলেছেন। কিন্তু লিপিড স্তর দুটির বিন্যাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মডেল বিবেচনা করা হয়েছে। কোষঝিল্লির গঠন সম্পর্কিত কয়েকটি মডেল হলো নিম্নরূপ-

১। Danielli Davson-এর স্যান্ডউইচ মডেল (১৯৩৫) : কোষঝিল্লির গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Danielli এবং Davson ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট মডেল প্রস্তাব করেন। তাদের মতে কোষঝিল্লি দ্বিস্তর বিশিষ্ট এবং প্রতি স্তরে প্রোটিন ও লিপিড উপস্তর আছে। ঝিল্লির উপর ও নিচে প্রোটিন স্তর এবং মাঝখানে লিপিড স্তর অবস্থিত। দুটি প্রোটিন স্তরের মাঝে লিপিড স্তরটি এমনভাবে সাজানো থাকে যে লিপিড অণুর হাইড্রোফোবিক লেজ অংশ পরস্পর মুখোমুখি এবং হাইড্রোফিলিক পোলার মস্তকগুলো বহি :র্মুখে অর্থাৎ প্রোটিন স্তরের দিকে অবস্থান করে। এটি স্যান্ডউইচ মডেল নামে পরিচিত।

২। Robertson-এর একক পর্দা মতবাদ (১৯৫৯) : বিজ্ঞানী J.D. Robertson ১৯৫৯ সালে ইলেকট্রন অণূবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ পূর্বক এ মডেলের প্রর্বতন করেন। এই মত অনুসারে কোষঝিল্লি ও বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণুর চারদিকে অবস্থিত সকল কোষীয় পর্দা একই রকম প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন (P-L-P) যুক্ত ত্রিস্তরী পর্দা। বাইরের প্রতিটি প্রোটিন স্তর ২০ - ২৫Å এবং মধ্যবর্তী (দ্বিস্তরীয়) লিপিড স্তর ২৫ - ৩৫Å পুরু হয়। ফলে কোষঝিল্লির মোট পুরুত্ব ৬৫ - ৮৫Å হয়। দ্বিস্তরীয় লিপিডের হাইড্রোফিলিক পোলার মস্তক প্রোটিন স্তরের দিকে এবং হাইড্রোফোবিক ননপোলার লেজ কেন্দ্রের দিকে অবস্থান করে। প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন (P-L-P) দিয়ে গঠিত ত্রিস্তরী পর্দাকে একক ঝিল্লি বা ইউনিট মেমব্রেন বলে।

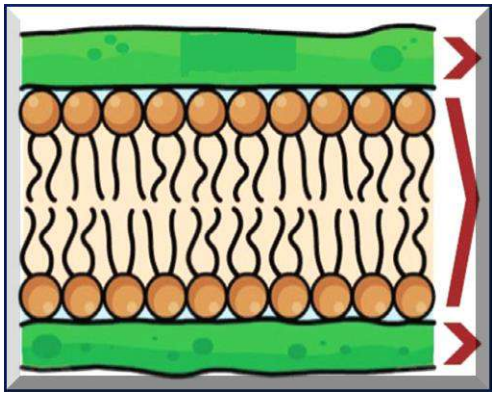

চিত্র : Danielli & Davson-এর স্যান্ডউইচ মডেল

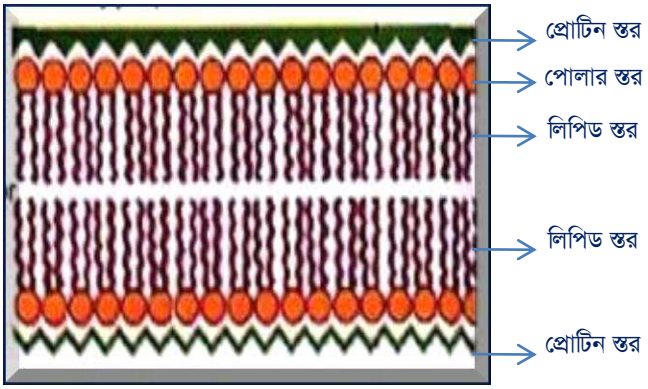

চিত্র : একক পর্দার গঠন (Robertson ১৯৫৯ অনুযায়ী)

৩। ফ্লুইড-মোজাইক মডেল (Fluid mosaic Model) : বিভিন্ন কোষবিজ্ঞানী কোষঝিল্লির গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন মডেল প্রস্তাব করেন, এর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহনীয় মডেল হলো ক্যালিফের্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী S.J. Singer এবং G.L. Nicolson (১৯৭২) এর ফ্লুইড-মোজাইক মডেল। এ মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লির গঠন নিরেটের পরিবর্তে ফ্লুইডের মতো এবং লিপিড ও প্রোটিন সঞ্চারণে সক্ষম। এ মডেল অনযায়ী ঝিল্লিটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট এবং প্রতিটি স্তর ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত। ফসফোলিপিড অণুর দুটি অংশ থাকে, যথা- হেড ও টেইল। ফসফেট হেডগুলো পানিগ্রাহী ও বাইরের দিকে এবং ফ্যাটি এসিড টেইলগুলো ভেতরের দিকে মুখোমুখি থাকে ও পানি বিকর্ষী হয়। বিজ্ঞানীদ্বয় লিপিড অণুর সাথে প্রোটিনের বিন্যাসকে হিমশৈলের সাথে তুলনা করেন বলে এ মডেলকে আইসবার্গ (Iceberg) মডেলও বলা হয়। ঝিল্লির প্রোটিন অণুগুলো ফসফোলিপিড স্তরে বিক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে। কার্বোহাইড্রেট, কোলেস্টেরল এবং অণান্য উপাদানও ফসফোলিপিড স্তরে মিশে থাকতে পারে।

ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লির গাঠনিক উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

(ক) ফসফোলিপিড বাইলেয়ার (Phospholipid bilayer) : কোষঝিল্লি দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে এবং প্রতিটি স্তর ফসফোলিপিড (অণু) দিয়ে গঠিত। প্রতিটি ফসফোলিপিডে এক অণু গ্লিসারল থাকে এবং গ্লিসারলের সাথে দুটি নন-পোলার ফ্যাটি এসিড লেজ এবং একটি পোলার ফসফেট মাথা থাকে। অর্ধতরল এই সংঘটনে লিপিড অণুগুলো সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করে।

(খ) মেমব্রেন প্রোটিন (Membrane protein) : কোষঝিল্লিতে তিন ধরনের প্রোটিন শনাক্ত করা হয়েছে। যেমন- ইন্টিগ্রাল প্রোটিন, পেরিফেরাল প্রোটিন ও লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন।

i. ইন্টিগ্রাল প্রোটিন : এগুলো ঝিল্লির উভয় পৃষ্টতল (সার্ফেস) পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে এবং লিপিড স্তরের মধ্যে প্রোথিত থাকে।

ii. পেরিফেরাল প্রোটিন : এগুলো ঝিল্লির পৃষ্টতলে থাকে। এদেরকে পর্দা থেকে সহজেই পৃথক করা যায়।

iii. লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন : এগুলো লিপিড কোর-এ সম্পৃক্ত থাকে।

(গ) গ্লাইকোক্যালিক্স (Glycocalyx) : এটি ঝিল্লির ওপর একটি চিনির স্তর বিশেষ। ফসফোলিপিড অণুর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোলিপিড ও প্রোটিন অণুর সাথে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন গঠন করে। গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স বলা হয়। কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খলগুলো সবসময় ঝিল্লির বহি :স্তরে অবস্থান করে। এগুলো কোষের চিহ্নিতকারী (recognizer) হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) কোলেস্টেরল (Cholesterol) : এটি লিপিড জাতীয় পদার্থ। ফসফোলিপিড অণুর ফাঁকে ফাঁকে এগুলো অবস্থান করে। ফসফোলিপিড অণুগুলো সবসময় সচল থাকে, কাঁপে, পরস্পরের সাথে ঠোকাটোকি করে লাফিয়ে উঠে এবং স্তরের মধ্যেই স্থান পরিবর্তন করে। এ ধরনের স্থানান্তর বা ঘুর্ণনকে Flip-flop movement বলে যা ফ্লুইড-মোজাইক মডেলকে বিশেষভাবে সমর্থন করে। ঐ অবস্থায় ঝিল্লিকে তখন তরল পদার্থের (fluid) মতো মনে হয়। অন্যদিকে, ঝিল্লিটিকে পৃষ্ঠতল থেকে দেখলে প্রাটিন অণুগুলোকে মোজাইক (mosaic)-এর মতো দেখায়। এ অবস্থাকে এক কথায় বোঝানোর জন্য ঝিল্লির মডেলের নাম হয়েছে ফ্লুইড-মোজাইক মডেল।

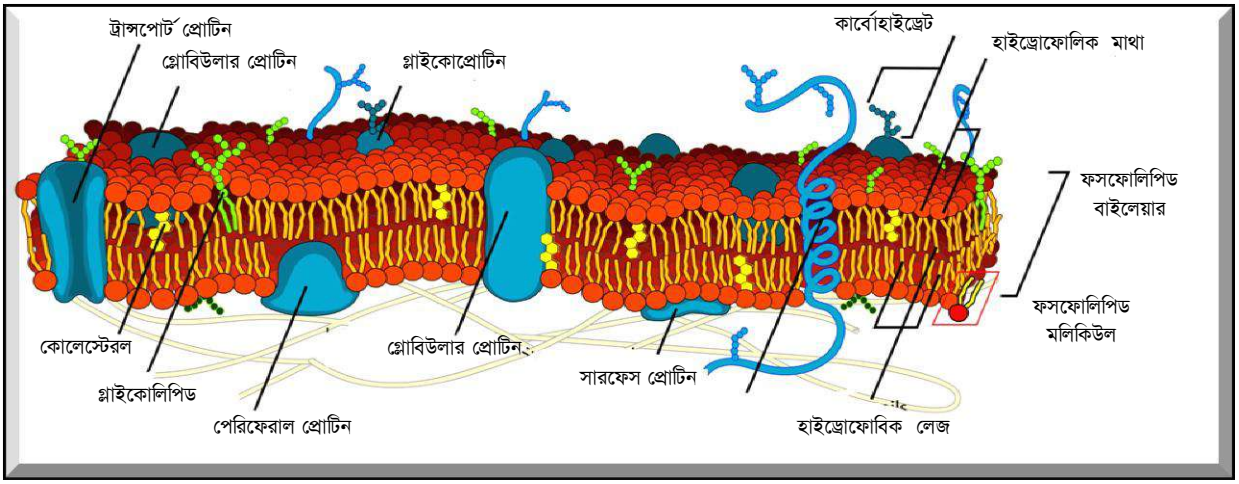

চিত্র : ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লীর গঠন

কোষঝিল্লির কাজ (Function of cell membrane) :

১। কোষঝিল্লি কোষকে ঘিরে একটা রক্ষণশীল আবরণের মতো কাজ করে।
২। ইহা কোষের অকার নির্ধারণের সাথে জড়িত।
৩। কোষের বিভিন্ন প্রকার পারিপার্শ্বিক অনুভূতি প্রেরণের উৎস হিসেবে কাজ করে।
৪। কোষঝিল্লি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর ক্ষত নিরাময়ে সক্ষম।
৫। বিভিন্ন বৃহদাণু (macro molucle) সংশ্লেষ করতে পারে।
৬। মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, নিউক্লিয়ার পর্দার মতো কোষীয় অঙ্গাণূ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
৭। এটি এনজাইম ও এন্টিজেন ক্ষরণ করে। হরমোন গ্রাহক হিসেবে এর ভূমিকা রয়েছে।
৮। প্রোটিন অণুগুলো এনজাইম হিসেবে বহিঃস্থ খাদ্যবস্তুকে পরিপাক করে।
৯। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কঠিন বস্তু এবং পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তরল বস্তু গ্রহণ করে।
১০। এটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি হিসেবে কাজ করে।

কোষঝিল্লির রূপান্তর (Modification of Cell Membrane) : কোষঝিল্লি বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয়। এতে নিম্নলেখিত রূপান্তরগুলি দেখা যায়-

১। মাইক্রোভিলাই (Microvilli) : কোনো কোনো কোষের কোষঝিল্লি ভাঁজ হয়ে কোষসমুহের মুক্তপ্রান্তে আঙুলের ন্যায় গঠন বিশিষ্ট কতকগুলো অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে। এদের মাইক্রোভিলাই বলে। অন্ত্রের এপিথেলিয়াম কোষ এবং বৃক্কের নেফ্রনের প্রতিটি কোষে প্রায় ৩০০০ মাইক্রোভিলাই দেখা যায়। এরা কোষের শোষণতল বৃদ্ধি করে।

২। ডেসমোজোম (Desmosome) : ঘন সন্নিবেশিত দুটি কোষের কোষ আবরণী রূপান্তরিত হয়ে টনোফাইব্রিল (tonofibril) তন্তুযুক্ত পাতের মতো গঠন সৃষ্টি করে, এদেরকে ডেসমোজোম বলে। এরা দুটি কোষকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে।

৩। পিনোসাইটিক ভেসিকল (Pinocytic vesicle) : কোষঝিল্লির কোথাও ফাটল সৃষ্টি হলে উক্ত ফাটল দিয়ে পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থ গড়িয়ে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পিনোসাইটিক ভেসিকল সৃষ্টি করে এবং এ প্রক্রিয়াকে পিনোসাইটোসিস (pinocytosis) বলা হয়।

৪। ফ্যাগোসাইটিক ভেসিকল (Phagocytic vesicle) : কঠিন বস্তু বা খাদ্যকণাকে আবৃত করে যে গহবর সৃষ্টি করে তাকে ফ্যাগোসাইটিক ভেসিকল বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বলা হয়।

৫। টাইট জাংশন (Tight junction) : ঘন সন্নিবেশিত দুটি কোষের কোষঝিল্লি অনেক সময় পরস্পর দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে টাইট জাংশন সৃষ্টি করে। ফলে কোষের এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কোনো পদার্থ যাতায়াত করতে পারে না। মস্তিস্কের নিউরনে এটি দেখা যায়।

৬। ক্ষণপদ (Pseudopodia) : কোষের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার সময় কোষঝিল্লি বাইরের দিকে যে প্রবর্ধক সৃষ্টি করে, তাকে ক্ষণপদ বা সিউডোপোডিয়া বলে। এগুলি কোষের গমন ও খাদ্যগ্রহণে অংশ নেয়।

কোষ প্রাচীর ও কোষঝিল্লীর মধ্যে পার্থক্য (Differences between cell wall and cell membrane) :

পার্থক্যর বিষয়	কোষপ্রাচীর (Cell wall)	কোষঝিল্লী (Cell membrane)
১। সজীবতা	কোষ প্রাচীর নির্জীব তথা জড়।	কোষঝিল্লী সজীব।
২। অবস্থান	কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য, কোষঝিল্লীর বাইরে অবস্থিত।	কোষঝিল্লী উদ্ভিদ ও প্রাণি উভয় প্রকার কোষে থাকে।
৩। স্তরসমুহ	তিনটি স্তরে বিন্যস্ত- মধ্যপর্দা, প্রাথমিক প্রাচীর ও সেকেন্ডারি প্রাচীর	প্রোটিন ও লিপিডের দুটি স্তর নিয়ে গঠিত।
৪। গঠন	এটি পুরু ও দৃঢ়, প্রধানত সেলুলোজ নির্মিত, তবে পেকটিন, কাইটিন, লিগনিন ইত্যাদিও থাকতে পারে।	এটি জীবন্ত, স্থিতিস্থাপক ও অর্ধভেদ্য পর্দাযুক্ত। প্রধানত প্রোটিন ও লিপিড সমন্বয়ে গঠিত।
৫। ভেদ্যতা	ভেদ্য, কখনও অভেদ্য।	সর্বদাই বৈষম্যভেদ্য বা প্রভেদক ভেদ্য।
৬। মাইক্রোভিলাই	থাকে না।	থাকে।
৭। কোষীয় অঙ্গাণু	বিভিন্ন প্রকার কোষীয় অঙ্গাণু সৃষ্টিতে ভূমিকা নেই।	কোষীয় অঙ্গাণু সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
৮। দৃঢ়তা	কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে থাকে।	কোষকে দৃঢ়তা দান করে না।
৯। অলঙ্করন	কোনো কোনো কোষের কোষপ্রাচীরে নানারকম অলঙ্করণ দেখা যয়।	কোনোরূপ অলঙ্করণ দেখা যায় না।
১০। কাজ	প্রধান কাজ হলো কোষের আকার আকৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং কোষকে দৃঢ়তা প্রদান।	প্রধান কাজ হলো কোষের ভেতর-বাইরে প্রয়োজনীয় বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমীয় অংশ সংরক্ষণ।

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) : গ্রিক শব্দ Cytos = cell বা কোষ এবং plasma = form বা সংগঠন থেকে সাইটোপ্লাজম শব্দটি গঠিত হয়েছে। কোষের কোষঝিল্লি থেকে শুরু করে নিউক্লিয় পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত অর্ধতরল, দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ অংশটিকে সাইটোপ্লাজম বলে। গঠন ও বৈশিষ্টের দিক থেকে সাইটোপ্লাজম এবং প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে উপাদানগত কোনো পার্থক্য নেই। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিউক্লিয়াসবিহীন প্রোটোপ্লাজমের নামই সাইটোপ্লাজম। বিজ্ঞানী কলিকার (Kolliker) ১৮৬২ সালে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে অবস্থিত কোষের এই অংশের নাকরণ করেন সাইটোপ্লাজম। এটি ১। সাইটোপ্লাজমিক মাতৃকা (cytoplasmic matrix), ২। সাইটোপ্লাজমীয় কঙ্কাল (cytoplasmic skeleton), ৩। এন্ডোমেমব্রেন তন্ত্র (endomembrane system), ৪। পর্দাবৃত অঙ্গাণু (membraned organilles), ৫। মাইক্রাটিউবিউলার অঙ্গাণু (microtubular organilles) অঙ্গগুলোর সমন্বয়ে গঠিত।

১। সাইটোপ্লাজমিক মাতৃকা (Cytoplasmic matrix) : সাইটোপ্লাজমের অর্ধতরল, অর্ধসচ্ছ, সমধর্মী ও কলয়ডীয় পদার্থকে সাইটোপ্লাজমিক মাতৃকা বা হায়ালোপ্লাজম বলে। হায়ালোপ্লাজম দু'টি অঞ্চলে বিভেদিত, যথা- এক্টোপ্লাজম (ectoplasm) বা বহি :প্লাজম এবং এন্ডোপ্লাজম (endoplasm) বা অন্ত :প্লাজম। মাতৃকার পরিধিয় অঞ্চল অর্থাৎ কোষঝিল্লি সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত কম দানাদার স্বচ্ছ ও আঠালো অঞ্চলটির নাম এক্টোপ্লাজম এবং ভেতরের দিকের দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ ও অপেক্ষাকৃত ঘন অঞ্চলটির নাম এন্ডোপ্লাজম। কোষের প্রকৃতি অনুসারে সাইটোপ্লাজমিক মাতৃকা তন্তুময়, দানাদার, জালকাকার অথবা কলয়ডাল হতে পারে।

২। সাইটোপ্লাজমীয় কঙ্কাল (Cytoplasmic skeleton) : অণুনালিকা ও অণুতন্তু দিয়ে তৈরি যে দৃঢ় অর্ন্তগঠন সাইটোপ্লাজমের আকৃতি প্রদান করে তাকে সাইটোপ্লাজমীয় কঙ্কাল বা সাইটোকঙ্কাল বলে। মাইক্রোফিলামেন্ট, মাইক্রোটিউবিউল ও ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট দ্বারা সাইটোকঙ্কাল গঠিত হয়।

৩। এন্ডোমেমব্রেন তন্ত্র (Endomembrane system) : কোষের সাইটোপ্রাজমে অবস্থিত- এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি বস্তু, লাইসোসোম ও ভ্যাকুওল নিয়ে এন্ডেমেমব্রেন তন্ত্র গঠিত হয়েছে।

৪। পর্দাবৃত অঙ্গাণু (Membraned organilles) : কোষের সাইটোপ্লাজমে যেসব পর্দাবেষ্টিত অঙ্গাণু থাকে সেগুলো হচ্ছে- মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, লাইসোসোম, পারঅক্সিজোম, গলগি বস্তু, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি।

৫। মাইক্রাটিউবিউলার অঙ্গাণু (Microtubular organilles) : কোষের সাইটোপ্রাজমে অবস্থিত বিভিন্ন মাইক্রাটিউবিউলার অঙ্গাণুগুলো হলো- সেন্ট্রিওল (centriole), বেসাল বডি (basal bodies) এবং সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা (cilia & flagella)।

সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক প্রকৃতি (Chemical nature of cytoplasm) : সাইটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজমের ন্যায় বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটি জটিল যৌগ। এর রাসায়নিক গঠন উপাদানকে অজৈব ও জৈব এই দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। অজৈব দ্রব্যের মধ্যে পানি, বিবিধ খনিজ লবন, বহু প্রকার আয়ন, পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাইটোপ্লাজমে পানির পরিমান (৬৫ - ৯৬%)। অবশ্য কোন কোনো কোষে এটি মাত্র ৫ - ১০% হতে পারে। জৈব উপাদানের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, জৈব এসিড, লিপিড, প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড, হরমোন, ভিটামিন, বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ, ATP প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতি অর্ধতরল, দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ, সমধর্মী ও কলায়ডাল।

সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic role of cytoplasm) : জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে থাকে ফলে জীবদেহ সচল থাকে। বিপাক বা মেটাবোলিজম (metebolism) বলতে জীবদেহে সংঘটিত সবধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টিকে বুঝায়। বিপাক মোটামুটিভাবে দু'ধরনের, যথা- উপচিতি (anabolism) বা গঠনমূলক এবং অপচিতি (catabolism) বা ধ্বংসাত্বক। সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো-

১। শ্বসন : এটি একটি জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোষে ATP তৈরি হয়। শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস ধাপটি সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকায় এবং অন্যান্য ধাপগুলো সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়। এটি একটি অপচিতিমূলক বিপাকীয় প্রক্রিয়া।

২। জীবনের স্পন্দন : যেকোন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া কেবল পানিয় মাধ্যমেই সম্ভব। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিপুল পরিমান পানি এবং এতে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বিপাকীয় ক্রিয়া চালু রেখে জীবনের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। পানির অভাবে কোষ তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এমনকি মারা যায়।

৩। সালোকসংশ্লেষণ : স্বভোজী জীবকোষের সাইটোপ্লাজমের ক্লোরোপ্লাস্টে যে বিপাক ঘটে তাতে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়। এই কার্বোহাইড্রেটই সমগ্র জীবজগতের প্রাথমিক খাদ্য।

৪। প্রোটিন সংশ্লেষণ : জীবদেহ গঠনে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। আর এই প্রোটিন তৈরির কারখানা হিসেবে কাজ করে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু- রাইবোজোম।

সাইটোপ্লাজমের কাজ (Function of cytoplasm) :

১। কোষীয়-অঙ্গাণু (cell organelles) ও কোষস্থ-বস্তু (cell inclusions) ধারণ করে।
২। বিপাকীয় কার্যাবলী পরিচালনা করে।
৩। রেচন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ নিস্কাষণ করে।
৪। কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।
৫। আবর্তনের মাধ্যমে অঙ্গাণুগুলোকে চলাচলে সহায়তা করে।
৬। এটি নিজে বৃদ্ধি পেয়ে কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং কোষ বিভাজনের সময় নিজেও বিভাজিত হয়।
৭। ইহা আলো ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনায় সাড়া দেয়।
৮। ইহা সমস্ত কোষ অঙ্গাণুর সজীবতা বজায় রাখে।

রাইবোজোম (Ribosome) : অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে, নিউক্লিয়ার পর্দার গায়ে, মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরে কিংবা সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছাড়ানো, প্রোটিন ও পলিপেপটাইড সংশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী গোলাকার বা ডিম্বাকার ঝিল্লিবিহীন কোষীয় অঙ্গাণুকে রাইবোজোম বলে।

আবিষ্কার ও নামকরণ (Discovery and naming) : বেলজিয়াম চিকিৎসক Albert Claude ১৯৪৩ সালে প্রথম যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোমের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তিনি প্রথম এর নাম দেন মাইক্রোসোম (microsome)। বিজ্ঞানী রবিনসন ও ব্রাউন (Robinson & Brown) ১৯৫৩ সালে উদ্ভিদকোষে রাইবোজোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। পরবর্তীকালে Roberts ১৯৫৮ সালে এর নাম দেন রাইবোজোম যা ribonucleo protein particle of microsomes-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

রাইবোজোমের সংখ্যা ও বিস্তৃতি (Number and extent of ribosomes) : প্রায় সব ধরনের কোষে রাইবোজোম থাকে। তবে প্রোটিন সংশ্লেষণ বেশী হয় এমন কোষে এদের সংখ্যা বেশী থাকে। আদি কোষে এগুলো সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে এবং প্রকৃত কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউক্লিয়ার পর্দা ও কোষঝিল্লির গাত্রে যুক্ত থাকে। ব্যাকটেরিয়া কোষে (*E. coli*) প্রায় ১০০০০ রাইবোজোম থাকে। একটি আদর্শ কোষে প্রায় ১০০০০০ টি রাইবোজোম থাকে।

রাইবোজোমের প্রকারভেদ (Type of ribosome) : আকার ও সেডিমেন্টেশন সহগ হিসেবে রাইবোজোম মূলত 70S এবং 80S এই দুই প্রকার হয়ে থাকে। 70S রাইবোজোম পাওয়া যায় আদিকোষী জীবে আর 80S রাইবোজোম পাওয়া যায় প্রকৃতকোষী জীবে। 70S রাইবোজোম 50S এবং 30S এই ।দুই সাব-ইউনিটে বিভক্ত থাকে। 80S রাইবোজোম, 60S এবং 40S এই ।দুই সাব-ইউনিটে বিভক্ত থাকে। প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় আদি কোষে 50S ও 30S সাব ইউনিট একত্রিত হয়ে 70S গঠন করে এবং প্রকৃত কোষে 60S ও 40S সাব ইউনিট একত্রিত হয়ে 80S গঠন করে ।

[কোনো বস্তুকে সেন্ট্রিফিউজ করলে তলায় তার অধ :ক্ষেপ জমা হয়। সেন্ট্রিফিউজ করা কালে বিভিন্ন ভর সম্পন্ন বস্তুর অধ :ক্ষেপনের হারকে S দিয়ে বোঝানো হয়। S = Svedberg unit = ভেদবার্গ একক; সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের দ্রুত ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভর সম্পন্ন বস্তুর অধ :ক্ষেপনের হারকে ভেদবার্গ একক বলে। সুইডিস প্রাণরসায়নবিদ Theodor Svedberg এর নামের প্রথম অক্ষর S দিয়ে তা বোঝানো হয়ে থাকে।]

রাইবোজোমের ভৌত গঠন (Physical structure of ribosome) : রাইবোজোম গোলাকার বা ডিম্বাকার পর্দাবিহীন দানাবিশেষ কোষ অঙ্গাণু এবং দু'টি উপ-একক নিয়ে গঠিত।। এটি চওড়ায় ২২ nm এবং উচ্চতায় ২০ nm। একটি ক্ষুদ্র টুপির মতো উপএকক ও একটি গম্বুজের মতো বৃহৎ উপএকক। ছোট উপএককটি বড়টির উপর গম্বুজের মতো সংযুক্ত হলেও এদের মাঝে একটি নলাকার পথ থাকে, যার মধ্য দিয়ে প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় mRNA যায়। রাইবোজোমের উপএকক দুটির মধ্যে তিনটি বিশেষ কর্যকরী অঞ্চল থাকে। যথা- অ্যামাইনো অ্যাসাইল অঞ্চল (amino acyl site) বা অ্যাকসেপ্টর অঞ্চল (acceptor site) বা A-site, পেপটাইড অঞ্চল (peptide site) বা P-site, একজিট অঞ্চল (exit site) বা E-site। যখন প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় তখন A-site-এ নতুন নতুন অ্যামাইনো এসিড গৃহীত হয়। P-site-এ সেগুলো পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। E-site-এর মাধ্যমে যে পলিপেপটাইড তৈরি হয় এবং সেটি রাইবোজোম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অনেকগুলো রাইবোজোম একটি সুক্ষ্ম mRNA সূত্রের সহায়তায় সংযুক্ত থাকলে তাকে পলিজোম (polysome) বা পলিরাইবোজোম (polyribosome) নামে অভিহিত করা হয়।

রাইবোজোমের রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of ribosome) : রাইবোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে RNA ও প্রোটিন। এরা প্রায় ১ : ১ অনুপাতে অবস্থান করে। 70S রাইবোজোমে রয়েছে 23S, 16S ও 5S মানের ৩টি tRNA অণু এবং ৫২ প্রকারের প্রোটিন অণু। অপরদিকে 80S রাইবোজোমে রয়েছে 28S, 18S, 5.8S ও 5S মানের ৪টি tRNA অণু এবং ৮০ প্রকারের প্রোটিন অণু। এছাড়া এত অল্প পরিমানে ধাতব আয়ন, যেমন- Mg^{++}, Ca^{++}, Mn^{++} ইত্যাদি থাকে।

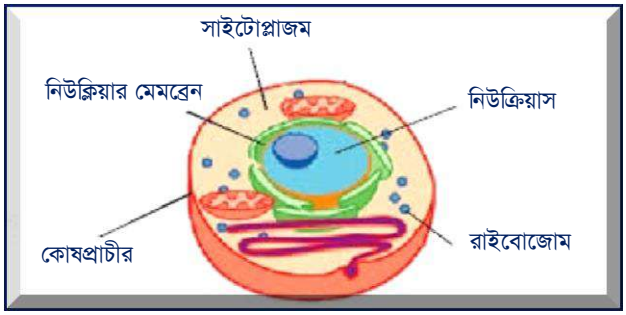

চিত্র : কোষস্থ রাইবোজোম

রাইবোজোমের কাজ (Function of ribosome) :

১। প্রোটিন সংশ্লেষণ করাই রাইবোজোমের প্রধান কাজ। প্রোটিন সংশ্লেষণের সাথে জড়িত থাকায় একে protein factory বা প্রোটিন তৈরির যন্ত্র বলা হয়।

২। mRNA কে নিউক্লিয়েজ এনজাইম ও নতুন পলিপেপটাইড চেইনকে প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্ষতিকর ক্রিয়া থেকে সুরক্ষা দান করে।

৩। স্নেহ বিপাক ও সাইটোক্রোম উৎপাদনে ভূমিকা পালন করে।

৪। গ্লুকোজের ফসফোরাইলেশন রাইবোজোমে সংঘটিত হয়।

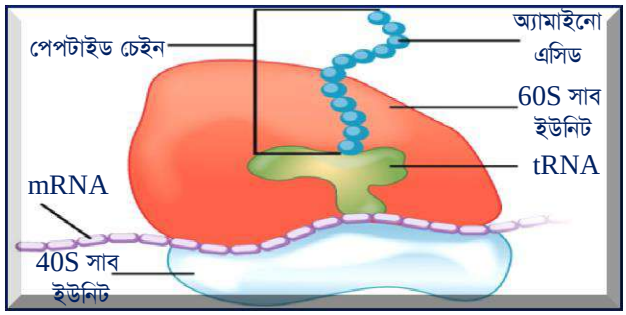

চিত্র : রাইবোজোমের গঠন

গলজি বস্তু (Golgi body) : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত একক পর্দাযুক্ত যেসব কোষীয় অঙ্গাণু গোলাকার বা সূত্রাকার, নিউক্লিয়াসের নিকট পরস্পর সমান্তরালভাবে সজ্জিত হয়ে কোষীয়ক্ষরণে বিশেষভাব ভূমিকা পালন করে, তাদের গলজি বস্তু (golgi body) বলে।

আবিষ্কার ও নামকরণ (Discover and nomenclature of golgi body) : ইতালির স্নায়ুতত্ত্ববিদ ক্যামিলো গলজি (Camillo Golgi) ১৮৯৮ সালে পেঁচার স্নায়ুকোষ অসমিয়াম টেট্রাক্সাইড দিয়ে রঞ্জিত করে নিউক্লিয়াসের সন্নিকটে একপ্রকার খন্ডিত বা অনেকাংশে অবিচ্ছিন্ন জালির ন্যায় ক্ষুদাঙ্গ হিসেবে এ অঙ্গাণুটি অবলোকন করেন এবং ইন্টারনাল রেটিক্যুলার অ্যাপারেটাস (internal reticular apparatus) নামকরণ করেন। তবে বিজ্ঞানীর নামানুসারে এই অঙ্গাণুটি গলজি বস্তু হিসেবে সুপরিচিত। স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের বিষয়ে গবেষণার জন্য ক্যামিলো গলজিকে ১৯০৬ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ডাল্টন ও ফেলিক্স (Dalton & Felix) ১৯৫৪ সালে গলজি বস্তুর আণুবীক্ষনিক গঠন ব্যাখ্যা করেন।

গলজি বস্তুর উৎপত্তি (Origin of golgi body) : গলজি বস্তুর উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। বিজ্ঞানী নোভিকফ (Novikoff - 1962) এর মতে- গলজি বস্তু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। বিজ্ঞানী বুচ (Bouch - 1965) এর মতে ইহা নিউক্লিয়ার পর্দা থেকে উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানী ড্যানিয়েলি (Danielli - 1966) এর মতে ইহা কোষঝিল্লি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। তবে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার সাথে গলজি বস্তুর মিল থাকার কারণে আরো অনেক বিজ্ঞানীগণ মনে করেন এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা থেকে এগুলো উৎপত্তি লাভ করে।

ভৌত গঠন (Physical structure of golgi body) : আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও এদের একটি নির্দিষ্ট গঠন কাঠামো বিদ্যমান। বিজ্ঞানী ডাল্টন ও ফেলিক্স (Dalton & Felix) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীগণের এর মতে ইহা তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা- ১। সিস্টারনি বা চ্যাপ্টা থলি, ২। ভ্যাকুওল বা বড় গহবর এবং ৩। ভেসিকল বা ছোট গহবর।

১। সিস্টারনি (Cisternae) বা চ্যাপ্টা থলি : গলজি বস্তুতে লম্বা, চ্যাপ্টা, অসমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং সমান্তরালভাবে অবস্থিত নালিকা সদৃশ্য বস্তুগুলোকে সিস্টারনি বলে। এগুলো সংখ্যায় ২ - ২০টি হয় এবং পরস্পর সমান্তরালভাবে এবং কিছুটা বাঁকানো অবস্থায় থাকে। খুব সম্ভবত এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা থেকে সিস্টারনির উৎপত্তি হয়। এগুলো সস্তুপাকার বা গাদা (stack) সৃষ্টি করে থাকে। প্রতি গাদায় সাধারণত ৩ - ৮টি সিস্টারনি থাকে। সিস্টারনির যে অংশটি কোষঝিল্লির কাছাকাছি থাকে তাকে ট্রান্স-ফেইজ (trans-face) এবং কোষের কেন্দ্রের দিকের অংশকে সিজ-ফেইজ (cis-face) বলে। ট্রান্স-ফেইজ থেকে ভ্যাকুওল ও ভেসিকলগুলো তৈরি হয়। গাদার অবস্থান অনুযায়ী সিস্টারনিসমুহের তিন রকমের নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- ট্রান্স-ফেইজ এর শেষ সিস্টারনাকে ট্রান্স-সিস্টারনি (trans-cisterna), সিজ-ফেইজ এর সিস্টারনাকে সিজ-সিস্টারনি (cis-cisterna) এবং গাদার (stack) মধ্যভাগের শেষ সিস্টারনিগুলোকে মেডিয়াল-সিস্টারনি (medial-cisternae) বলে। সবগুলো সংগঠন ইন্টারসিস্টারনাল বস্তু দিয়ে একসাথে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

২। ভ্যাকুওল (Vacuole) বা বড় গহবর : সিস্টারনির প্রাচীর প্রশস্ত হয়ে ভ্যাকুওল বা বড় গহবর সৃস্টি হয়। ভ্যাকুওলগুলো সাধারণত সিস্টারনির কাছাকাছি স্থানে গোলাকার থলির আকারে বিদ্যমান। এগুলোর ব্যাস ৩০-৪০Å। এসব ভ্যাকুওলের মধ্যে ক্ষরণবস্তু থাকে।

৩। ভেসিকল (Vesicle) বা ক্ষুদ্র গহবর : সিস্টারনির পরিধির দিকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার থলির মতো বস্তুগুলো সংলগ্ন থাকে তাদের ভেসিকল বলে। এগুলো সিস্টারনির পরিনত তল হতে সৃষ্টি হয়। এগুলো পৃথক পৃথক বা দলবদ্ধভাবে থাকতে পারে এবং মসৃণ বা অমসৃণ আবরণী বিশিষ্ট হতে পারে। অনেক সময় সিস্টারনিগুলির প্রান্তদেশে ও পরিণতির তলে ৩০ - ৫০ nm ব্যাসবিশিষ্ট কিছু নালিকার মতো জালক দেখা যায় যেগুলো সিস্টারনিগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে, এদেরকে টিউবিউলস (tubules) বলে।

রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of golgi body) : গলজি বস্তুর ঝিল্লি লিপোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। এদের পর্দায় প্রায় ৬০% প্রোটিন এবং ৪০% ফসফোলিপিড থাকে। এর প্রকোষ্টের মধ্যেও কিছু প্রোটিন ও লিপিড থাকে। লিপিডের মধ্যে রয়েছে প্রধানত লেসিথিন ও সেফালিন জাতীয় ফসফোলিপিড। এছাড়া ক্যারোটিনয়েড, ফ্যাটিএসিড ও ভিটামিন সি থাকে। বিভিন্ন প্রকার এনজাইম দ্বারা এদর থলিগুলো পূর্ণ থাকে। যেমন- ADPase, CTPase, ATPase, TTPase, NADH, সাইটোক্রোম, গ্লুকোজ-৬ ফসফেট ইত্যাদি।

চিত্র : গলজি বস্তুর গঠন

গলজি বস্তুর কাজ (Function of golgi body) :

১। গলজি বস্তুর প্রধান কাজ কোষের ক্ষরণ। এটি এনজাইম ও হরমোনসহ বিভিন্ন বিপাকীয় দ্রব্য ক্ষরণ ও নি :সরণ করে।

২। কোষপ্রাচীর ও কোষঝিল্লি গঠনে সহায়তা করে।

৩। এরা লাইসোজোম তৈরি করে।

৪। এরা শুক্রাণু গঠনে সহায়তা করে।

৫। মাইটোকন্ড্রিয়াকে ATP উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে।

৬। কোষ বিভাজনের সময় কোষপ্লেট তৈরি করে।

৭। উদ্ভিদকোষে গলজি বস্তুর প্রধান কাজ বিভিন্ন পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষণ ও পরিবহনে অংশগ্রহণ করা, তাই **উদ্ভিদকোষে গলজি বস্তুকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয়।**

লাইসোজোম (Lysosome) : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান লিপোপ্রোটিন নির্মিত একক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত যে কোষ অঙ্গাণু হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের আধার হিসেবে কাজ করে, তাকে লাইসোজোম বলে। এটি গ্রীকশব্দ lyso = digestive বা হজমকারী ও soma বা বডি নামক দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত।

লাইসোজামের আবিষ্কার (Discovery of lysosome) : Christian De Duve ১৯৫৫ সালে প্রাণিকোষে এটি পর্যবেক্ষণ ও নামকরণ করেন। Novikoff ১৯৬০ সালে এদের আণুবিক্ষণিক গঠন বর্ণনা দেন এবং Matile ১৯৬৪ সালে এটি *Neurospora* ছত্রাকে পর্যবেক্ষণ করেন। সম্পতি উদ্ভিদকোষে লাইসোজোমের ন্যায় স্ফোরোজোম (spherosome) আবিস্কৃত হয়েছে যাদের অলিওজোমও (oleosome) বলা হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদ কোষের স্ফোরোজোমে (ভুট্টার মূলের অগ্রভাগ, তামাকের এন্ডোস্পার্মে) হাইড্রোলাইটিক এনজাইম থাকে বলে অনেকে একে উদ্ভিদ লাইসোজোম (plant lysosome) বলে।

লাইসোজোমের উৎপত্তি (Origin of lysosome) : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও গলজিবস্তু হতে এদের উৎপত্তি হয়। গলজি বস্তুর সিস্টারনির প্রান্ত বিছিন্ন হয়ে লাইসোজোম উৎপন্ন হয়।

লাইসোজোমের অবস্থান (Location of lysosome) : কতিপয় উদ্ভিদকোষ এবং বেশিরভাগ প্রাণিকোষে লাইসোজোম পাওয়া যায়। উদ্ভিদের ভাজক কলা, পেয়াজের বীজ, ভুট্টা ও তামাকের চারার কোষে এবং প্রোটোজোয়া, স্তন্যপায়ী প্রাণির যকৃত, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয়, মস্তিস্ক ও থাইরয়েড কোষে লাইসোজোম পাওয়া যায়। প্রাণির শ্বেত রক্তকণিকায় প্রচুর লাইসোজোম থাকলেও লোহিত রক্ত কণিকায় লাইসোজোম থাকে না।

লাইসোজোমের ভৌত গঠন (Physical structure of lysosome) : লাইসোজোম এক ধরনের ক্ষুদ্র, গোল থলি আকৃতির অঙ্গাণু। এরা সাধারণত গলজি বস্তুর কাছাকাছি অবস্থান করে। প্রতিটি লাইসোজোম দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- ১। আবরণী (Membrane) ও ২। ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (Matrix)।

১। আবরণী (Membrane) : লাইসোজোম লিপোপ্রোটিন নির্মিত একক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যাকে সীমান্ত পর্দা বা আবরণী বলে। আবরণী পর্দায় অম্লীয় ও গ্লাইকোসাইলেটেড অন্ত :স্থ প্রোটিন থাকে। এগুলো লাইসোজোমের এনজাইমের ক্রিয়া হতে আবরণীকে রক্ষা করে। এসব পদার্থকে স্টেবিলাইজার (stabilizer) বলে।

২। ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (Matrix) : লাইসোজোমের গহবরে যে অসমসত্ত্ব দানাদার পদার্থ থাকে তাকে ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স বলে। তরলে উপস্থিত এ সমস্থ দানাগুলি ৫৫-৮০Å ব্যাসযুক্ত হয়। এর ধাত্রে প্রায় ৫০টির মতো আর্দ্রবিশ্লেষক এনজাইম (hydrolytic enzyme), অপাচ্যবস্তু ও দানাদার বস্তু থাকে।

লাইসোজোমের রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of lysosome) : লাইসোজোম লিপো-প্রোটিন নির্মিত ঝিল্লিতে বেষ্টিত একগুচ্ছ এনজাইম জালিকা বিশেষ। এতে রয়েছে এসিড ফসফোটেজ নামে টিস্যু বিগলনকারী এনজাইম। অন্যান্য এনজাইমের মধ্যে রয়েছে অ্যারাইল সালফাটেজ, এসিড লাইপেজ, DNAase, RNAase, ফসফোলাইপেজ, এস্টারেজ, ডেক্সট্রোনেজ, স্যাকারেজ ও লাইসোজাইম সহ প্রায় ৫০ধরনের এনজাইম। এর ভেতরে অনেক সময় অপাচিত চর্বির মায়োলিন তন্তু ও বিভিন্ন দানাসদৃশ্য বস্তু দেখা যায়। একেকটি লাইসোজাম একেক ধরনের এনজাইম সমৃদ্ধ অর্থাৎ প্রতিটি লাইসোজোমে নির্দিষ্ট এক ধরনের এনজাইম থাকে।

লাইসোজোমের প্রকারভেদ (Type of lysosome) : কার্যরত লাইসোজোমের আকৃতিগত ও কার্যগত পরিবর্তন অনুসারে প্রকারভেদ দেখা যায়। এ ঘটনাকে বহুরূপতা (polymorphism) বলে। সাধারণত চার প্রকার লাইসোজোম দেখা যায়, যথা- ১। প্রাথমিক লাইসোজোম (Primary lysosome), ২। গৌন লাইসোজোম (Secondary lysosome), ৩। অটোফ্যাগোজোম (Autophagosome) ও ৪। রেসিডুয়াল বডি (Residual body)।

১। প্রাথমিক লাইসোজোম (Primary lysosome) : গলজি বস্তু থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র (৫-৮ nm), গোলাকার লাইসোজোম (প্রকৃত লাইসোজোম), যার মধ্যে সদ্য সৃষ্ট আর্দ্র-বিশ্লেষক উৎসেচকগুলি সুক্ষ্ম দানার আকারে অবস্থান করে। তবে এই উৎসেচকগুলি অধিকাংশ সময়ই নিষ্ক্রিয় থাকে অর্থাৎ পরিপাকে অংশগ্রহণ করে না।

২। গৌন লাইসোজোম (Secondary lysosome) : ফ্যাগোসাইটোসিস বা পিনোসাইটোসিসের ফলে উৎপন্ন ফ্যাগোজোম (phagosome) বা পিনোজোম (pinosome)-এর সঙ্গে এক বা একাধিক লাইসোজোম মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় যে লাইসোজোম গঠিত হয় এবং যার পরিপাককারী ক্ষমতা আছে তাকে গৌণ লাইসোজোম বলে।

৩। অটোফ্যাগোজোম (Autophagosome) : কোষের অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্চিত কোষীয় অংশ (মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রভৃতি) মসৃণ পর্দা দ্বারা আবৃত হয়ে পৃথক অংশ (isolation body) গঠণ করে। এর সঙ্গে এক বা একাধিক প্রাথমিক লাইসোজোম যুক্ত হয়ে যে লাইসোজোম গঠিত হয়, তাকে অটোফ্যাগোজোম বলে।

৪। রেসিডুয়াল বডি (Residual body) : অপাচিত বস্তুযুক্ত গৌন লাইসোজোমকে রেসিডুয়াল বডি বা টেলোলাইসোজোম বলে। এগুলো কোষপর্দার কাছে এসে এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতিতে অপাচিত পদার্থকে কোষের বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

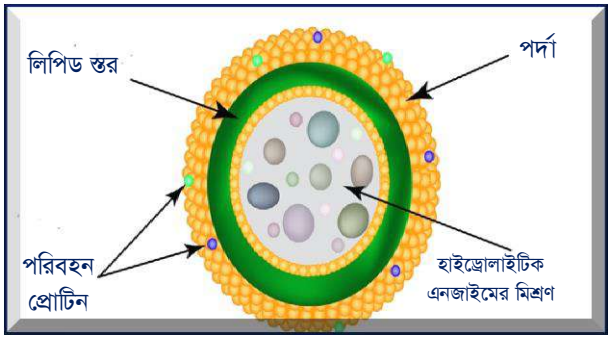

চিত্র : লাইসোজোমের গঠন

লাইসোজোমের কাজ (Function of lysosome) :

১। লাইসোজোম নানা প্রকার এনজাইম ধারণ করে যা কোষমধ্যস্থ খাদ্যকণা পরিপাকে ব্যবহার হয়।

২। ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) পদ্ধতিতে আক্রমণকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে।

৩। প্রতিকূল অবস্থায় সম্পূর্ণ কোষ বা দেহকে ধ্বংস করে দেয়, যাকে অটোলাইসিস (autolysis) বলে।

৪। এরা কোষে কেরোটিন (carotene) প্রস্তুত করে।

৫। খাদ্যভাব দেখা দিলে কোষস্থ উপাদান ও অঙ্গাণুগুলোকে ধ্বংস করে, যাকে অটোফ্যাগি (autophagy) বলে।

৬। কোষ বিভাজনকালে এরা কোষীয় উদ্দীপনা যোগায় ও নিউক্লিয় আবরণী ভাঙ্গতে সাহায্য করে।

৭। ইহা কোষের অকেজো অঙ্গাণুগুলোকে অপসারণ করে।

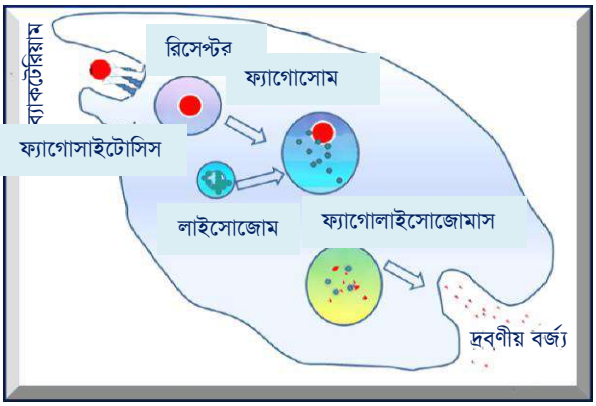

চিত্র : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতি

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic Reticulum) : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একক পর্দাবৃত, জালিকাকার অঙ্গাণু যা একাধারে কোষঝিল্লি ও নিউক্লিয়ার পর্দার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে এবং সাইটোপ্লাজমকে অনিয়মিত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে, তাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (endoplasmic reticulum) বা অন্ত :প্লাজমীয় জালিকা বলে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের আবিষ্কার (Discover of endoplasmic reticulum) : Keith. R. Porter ও তার সহকর্মীগণ (Claude & Fullam) ১৯৪৫ সালে সাইটোপ্লাজমে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। বিজ্ঞানী (Porter) ও কালম্যান (Kallman) ১৯৫২ সালে এর নামকরণ করেন। এসব নালিকা দ্বিস্তরী ইউনিট মেমব্রেন দিয়ে আবৃত। বিভিন্ন নালিকা পরস্পর যুক্ত হয়ে এরা একটি অবিচ্ছিন্ন জালের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উৎপত্তি (Origin of endoplasmic reticulum) : সাইটোপ্লাজমীয় ঝিল্লি, নিউক্লিয়ার ঝিল্লি অথবা কোষঝিল্লি থেকে সাধারণত এদের উৎপত্তি হয়।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের বিস্তৃতি (Distribution of endoplasmic reticulum) : আদিকোষ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণির লোহিত কণিকা ব্যতীত প্রায় সব কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায়, তবে যকৃত ও অগ্নাশয়ের মতো যে সব অঙ্গে প্রোটিন সংশ্লেষণ বেশি হয় সেখানে এদের পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যায়। এটি স্থানে স্থানে নিউক্লিয়ার পর্দার সাথে যুক্ত থাকে। কোষের আয়তনের সাথে এদের সংখ্যা নির্ভরশীল। কোষের আয়তন বড় হলে এদের সংখ্যা বেশি হয়।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভৌত গঠন (Physical structure of endoplasmic reticulum) : গঠনশৈলীর ভিত্তিতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- ১। সিস্টারনি (cisternae), ২। ভেসিকল (vesicle) ও ৩। টিউবিউল (tubule)।

১। সিস্টারনি (Cisternae) : দুপাশে চাপা, লম্বা, শাখাবিহীন ও সমান্তরালভাবে বিন্যাস্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামকে সিস্টারনি বলে। এদের ব্যাস সাধারণত ৪০ - ৫০ mn। এদের গায়ে অনেক সময় রাইবোজোম যুক্ত থাকে। যকৃত, অগ্ন্যাশয় ও মস্তিস্কের কোষে অধিক সংখ্যায় সিস্টারনি থাকে।

২। ভেসিকল (Vesicle) : এগুলো সাধারণত গোলাকৃতির বা ডিম্বাকৃতির এবং পর্দাবেষ্টিত গহবরের মতো। এগুলো সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে। এদের ব্যাস সাধারণত ২৫ - ৫০ mn পর্যন্ত হয়।

৩। টিউবিউল (Tubule) : এরা সরু ও শাখাপ্রশাখাযুক্ত এবং বিভিন্ন আকৃতির হয়। এদের ব্যাস সাধারণত ৩০-১৯০ মিলিমাইক্রোন (mn) পর্যন্ত হয়। টিউবিউলগুলো সিস্টারনি ও ভেসিকলের সাথে সংযুক্ত হয়ে জালের মতো গঠণ তৈরি করে। সাধারণত এদের গায়ে রাইবোজোম থাকে না।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of endoplasmic reticulum) : সবধরনের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম লিপোপ্রোটিন (লিপিড ৩০ - ৪০% ও প্রোটিন ৬০ - ৭০%) নির্মিত ত্রিস্তরী ঝিল্লিযুক্ত। এত প্রায় ১৫ ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়; যেমন- ফসফেটেজ, এস্টারেজ, সক্রিয় ATPase, NADH, গ্লিসারাইড সংশ্লেষণকারী এনজাইম প্রভৃতি।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের প্রকারভেদ (Type of endoplasmic reticulum) : রাইবোজোমের উপস্থিতির উপর ভিক্তি করে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দু'রকম; যথা- ১। মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও ২। অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম।

১। মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Smooth endoplasmic reticulum) : যেসব এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে রাইবোজোম যুক্ত থাকে না সেগুলোকে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে। যেসব কোষে অপ্রোটিন (লিপিড ও হরমোন) জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণের প্রাধান্য বিদ্যমান সেখানে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের আধিক্য দেখা যায়। যেমন- অ্যাডিপোজ কোষ, শুক্রাশয় প্রভৃতি।

২। অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Uneven endoplasmic reticulum) : যেসব এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে রাইবোজোম যুক্ত থাকে সেগুলোকে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে। যেসব কোষ সক্রিয়ভাবে প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে সে সকল কোষে এদের আধিক্য পরিরক্ষিত হয়, যেমন-অগ্নাশয় কোষ, প্লাজমা কোষ, যকৃত কোষ প্রভৃতি। এদের গায়ে গ্লাইঅক্সিজোম নামক ক্ষুদ্রাকার কণা থাকতে পারে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ (Function of endoplasmic reticulum) :

১। এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে।

২। অমসৃণ রেটিকুলামে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

৩। মসৃণ রেটিকুলামে লিপিড, বিভিন্ন হরমোন, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি সংশ্লেষিত হয়।

৪। এটি প্রোটিন ও লিপিডের অন্ত :বাহক হিসেবে কাজ করে।

৫। রাইবোজোম ও গ্লাইঅক্সিজোমের ধারক হিসেবে কাজ করে।

৬। অনেকের মতে এতে কোষপ্রাচীরের জন্য সেলুলোজ তৈরি হয়।

৭। এরা কোষের হায়ালোপ্লাজমকে ছোট ছোট কুঠুরিতে বিভক্ত করে যান্ত্রিক শক্তি যোগান দেয়।

৮। এর পর্দা থেকে নতুন নিউক্লিওপর্দা তৈরি হয়।

৯। এরা কোষে অণুপ্রবেশকারী বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করে।

১০। এর টিউবিউলগুলি কোষীয় বস্তুর পরিবহনে অংশ নেয়।

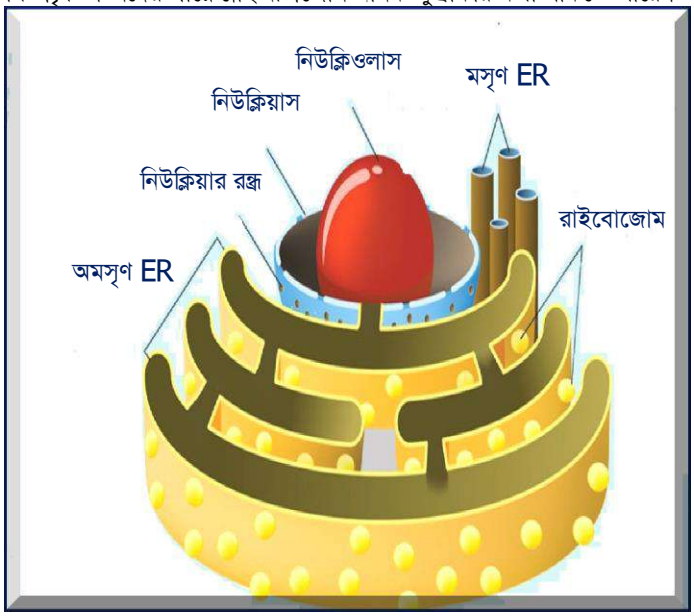

চিত্র : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) : মাইটোকন্ড্রিয়া শব্দটি গ্রীক mito = thread অর্থাৎ সূত্র এবং chondrion = granule অর্থাৎ দানা এই দুটি শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃত জীবকোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু হলো মাইটোকন্ড্রিয়া । কোষের যাবতীয় জৈবনিক কাজের শক্তি সরবরাহ করে বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের 'পাওয়ার হাউজ' বা শক্তিঘর বলা হয়। এ অঙ্গাণুতে ক্রেবস চক্র, ফ্যাটি এসিড চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিরাজমান দ্বিস্তর বিশিষ্ট পর্দা দ্বারা আবৃত গোলাকার, দণ্ডাকার, বৃত্তাকার অথবা তারকাকার বদ্ধ থলির মতো যে সকল অঙ্গাণু সবাত শ্বসনে অংশগ্রহণ করে কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করে, তাকে মাইটোকন্ড্রিয়া (mitochondria) বলা হয়।

মাইটোকন্ড্রিয়ার আবিষ্কার ও নামকরণ (Discover & nomencluture of mitochondria) : ১৮৫০ সালে বিজ্ঞানী কলিকার (Albert Von Kolliker) সাইটোপ্লাজমে (পতঙ্গের পেশিকোষে) নানা আকৃতিবিশিষ্ট এসব অঙ্গাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৮২ সালে W. Fleming কোষে সূতাকৃতির মাইটোকন্ড্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন এবং ফিলা (fila) নামকরণ করেন। ১৮৯৪ সালে রিচার্ড অল্টম্যান (Richard Altman) সর্বপ্রথম মাইটোকন্ড্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং বায়োপ্লাস্ট (bioplast) নাম দেন। ১৮৯৭ সালে কার্ল বেন্দা (Carl Benda) এ অঙ্গাণুগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা মাইটোকন্ড্রিয়াকে অর্ধ স্ব-নির্ভর অঙ্গাণু (semi-autonomous cell organelles) বলতে চান। কারণ এর স্ব-প্রজননশীল DNA থেকে m-RNA, t-RNA, r-RNA-এর সংশ্লেষণ ঘটে, অন্ত :পর্দায় কিছু প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। মাইটোকন্ড্রিয়াকে কনড্রিওজোম (chondriosome), প্লাজমোজোম (plasmosome) ও বলা হয়ে থাকে। কোষের সাইটোপ্লাজমে এরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। কোষ আয়তনের প্রায় ২০ ভাগ হলো মাইটোকন্ড্রিয়া।

মাইটোকন্ড্রিয়ার উৎপত্তি (Origin of mitochondria) : বিভাজনের মাধ্যমে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোষে একটি মাত্র মাইটোকন্ড্রিয়ন (বহুবচনে মাইটোকন্ড্রিয়া) থাকলে তা কোষ বিভাজনের সাথেই বিভাজিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী রবার্টসনের মতে, কোষে বিভিন্ন পর্দা (যথা- প্লাজমামেমব্রেন, আন্ত :প্লাজমীয় ঝিল্লি) থেকে মুকুলোদগম পদ্ধতিতে মাইটোকন্ড্রিয়া উৎপন্ন হয়।

মাইটোকন্ড্রিয়ার আকৃতি (Shape of mitochondria) : মাইটোকন্ড্রিয়া সাধারনত দণ্ডাকার, সূত্রাকার, দানাদার, গোলাকার, সর্পিলাকার ইত্যাদি আকৃতির হতে পারে। যদিও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে এদের আকার-আকৃতিতে পার্থক্য থাকে তারপরেও একই জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেও আকার-আকৃতিতে পার্থক্য দেখা যায়।

মাইটোকন্ড্রিয়ার আয়তন (Volume of mitochondria) : আকারভেদে মাইটোকন্ড্রিয়ার আয়তন বিভিন্ন রকম হয়। বৃত্তাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার ব্যাস ০.২ - ২।০ মাইক্রোন, সূত্রাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৪০ - ৭০ মাইক্রোন এবং দন্ডাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৯ মাইক্রোন ও প্রস্থ ০.৫ মাইক্রোন পর্যন্ত হতে পারে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা (Number of mitochondria) : উদ্ভিদ ও প্রাণির প্রজাতিভেদে এবং কোষের সক্রিয়তা ও শারীরবৃত্তীয় কাজের ওপরেই প্রতি কোষে এদের সংখ্যা নির্ভর করে। প্রতিটি কোষে সাধারণত ৩০০ - ৪০০টি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। উন্নত উদ্ভিদকোষে ১০০ - ৩০০০টি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। যে কোনো কোষে বার্ধক্যপ্রাপ্তির সাথে সাথে এদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার ভৌত গঠন (Physical structure of mitochondria) : ইলেককট্রণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়ায় নিম্নে বর্ণিত অংশগুলো দৃষ্টি গোচর হয়।

১। আবরণী (Membrane) : প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়া একটি দ্বিস্তরী আবরণী দ্বারা আবৃত। প্রতিটি পর্দা লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি। বাইরের পর্দাকে বহিপর্দা (outer membrane) এবং ভিতরের পর্দাকে অন্তপর্দা (inner membrane) বলে। পর্দা দু'টির মাঝে ৬ - ৮ মাইক্রোন ফাঁকা স্থান থাকে এবং এই ফাঁকা স্থানকে পেরিমাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেস (perimitochondrial space) বলে । এই অংশে কো-এনজাইমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাইরের পর্দাটি মসৃণ কিন্তু ভেতরের স্তরটি কেন্দ্রের দিকে অনেক ভাঁজবিশিষ্ট আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি করে, এদের ক্রিস্টি বলে। বাইরের পর্দা ভেদ করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অণু এবং আয়ন ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, আবার বের হয়ে যেতেও পারে।

২। প্রকোষ্ঠ (Chamber) : দু'টি পর্দার মাঝে অবস্থিত ফাঁকা স্থানকে বহি :প্রকোষ্ঠ বলে। এতে কো-এনজাইম সমৃদ্ধ তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। আবার শুধূমাত্র অন্ত :পর্দা বেষ্টিত ভেতরের গহবরকে আন্ত :প্রকোষ্ঠ বলে। এর ভেতরে ঘন দানাদার হোমোজেনিয়াস এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ পদার্থ থাকে, যাকে ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (matrix) বলে। ম্যাট্রিক্সে নিজস্ব চক্রাকার DNA, কিছু রাইবোজোম ও কিছু ফসফেট দানা থাকে।

৩। ক্রিস্টি (Cristae) : বাইরের পর্দাটি সোজা কিন্তু ভেতরের পর্দাটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি করে। প্রবর্ধিত এ অংশগুলোকে ক্রিস্টি (cristae) বলে। এদের সংখ্যা ও আকৃতি বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন রকম হয়। ক্রিস্টিগুলো সাধারণত অনুপ্রস্থ বরাবর সাজানো থাকে। ক্রিস্টির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে অন্ত :ক্রিস্টি ফাঁকা স্থান (intractristal space) বলে, যা বহি :প্রকোষ্ঠের সাথে সংযুক্ত।

৪। অক্সিজোম (Oxisome) : মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্ত :পর্দার ক্রিস্টি সংলগ্ন স্থানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃন্তযুক্ত দানা থাকে, তাদেরকে অক্সিজোম বলে। অক্সিজোম বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন হতে পারে। বৃন্তক অক্সিজোম মস্তক, বোঁটা ও ভূমি নিয়ে গঠিত। মস্তক অংশে ATP এনজাইম হিসেবে কাজ করে যা ATP সংশ্লেষে ও ATP এর জারনে অংশগ্রহণ করে।

৫। ATP Synthases ও ETC : ক্রিস্টির স্থানে স্থানে ATP synthases নামক গোলাকার বস্তু আছে। এতে ATP সংশ্লেষিত হয়। এছাড়া সমস্ত ক্রিস্টিব্যাপি অনেক Electron Transport Chain (ETC) অবস্থিত। পেরিমাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেসের দিকের প্রান্তকে C-ফেস্ এবং ম্যাট্রিক্সের দিকের প্রান্তকে H-ফেস বলে। অন্তপর্দার অন্ত :গাত্রে শ্বসনে অংশগ্রহণকারী এনজাইম থাকে।

৬। DNA ও রাইবোজোম : মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA একটি বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক অণু। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য একে মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA বলে। মাইটোকন্ড্রিয়াতে এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য 70S রাইবোজোম পাওয়া যায় যা আদিকোষের রাইবোজোমের সাথে তুলনীয়।

মাইটোকন্ড্রিয়ার রাসায়নিক গঠন (Chemical structure of mitochondria) : মাইটোকন্ড্রিয়ার পর্দা লিপোপ্রোটিন জাতীয়। এতে ৬৫% প্রোটিন. ২৫ - ৩০% লিপিড, ০.৫% RNA ও সামান্য DNA থাকে। লিপিডের মধ্যে ৯০% ফসফোলিপিড, ৫% কোলেস্টেরল থাকে। সামান্য পরিমানে খনিজ ধাতুর আয়ন (Ca, Mg, Mn, Ag) ও ভিটামিন (B_6, B_{12}, K, E) থাকে। এতে প্রায় ১০০ প্রকার এনজাইম ও কো-এনজাইমের উপস্থিতি জানা যায়। এনজাইমগুলোর মধ্যে মনোঅ্যামিন অক্সিডেজ, অ্যাডিনাইলেট কাইনেজ ফিউমারেজ অন্যতম। এগুলোর প্রায় সবই ম্যাট্রিক্সে এবং দুই ঝিল্লির মধ্যবর্তী স্থানে বিস্তৃত।

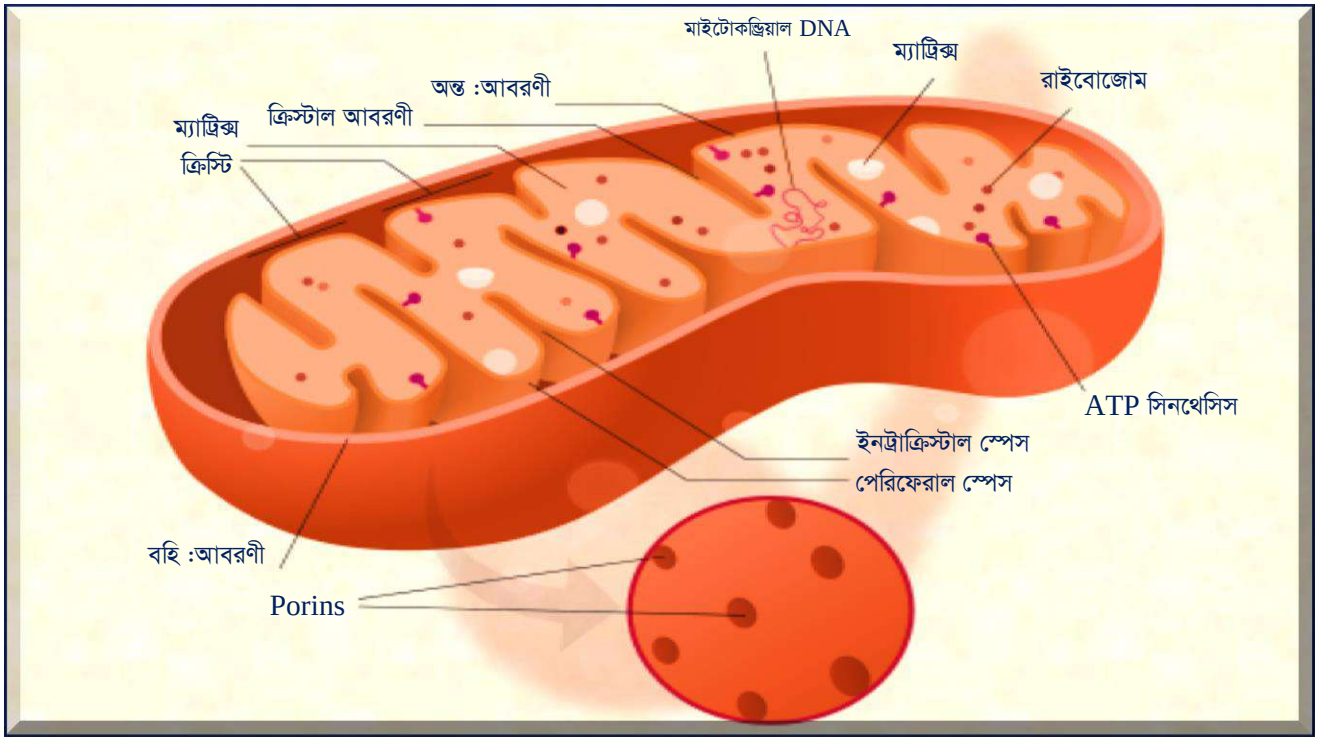

চিত্র : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্যচ্ছেদ

মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ (Function of mitochondria) :

১।শ্বসন কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন এনজাইম ও কো-এনজাইম মাইটোকন্ড্রিয়া সরবরাহ করে।

২। গ্লাইকোলাইসিস ছাড়া শ্বসনের সব কটি বিক্রিয়া (যথা- ক্রেবস চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইত্যাদি) এর অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়।

৩। এরা কোষে লৌহ ও স্টেরয়েড পদার্থের জৈব সংশ্লেষ ঘটায়।

৪। এরা নিজস্ব DNA, RNA উৎপন্ন করে এবং বংশগতিতে ভূমিকা রাখে।

৫। কোষে শ্বসনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের মূল প্রক্রিয়াটি মাইটোকন্ড্রিয়াতে সাধিত হয় বলে একে জীবদেহের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র (power house) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৬। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠণে অংশগ্রহণ করে।

৭। এরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাটায়ন, যেমন- Ca, S, Fe, Mn ইত্যাদি সঞ্চয় করে।

৮। রক্তকণিকা ও হরমোন উৎপাদনে সহায়তা করে।

৯। স্নেহ বিপাকে এরা অংশগ্রহণ করে।

১০। ADP-কে ATP-তে রূপান্তর করার মাধ্যমে উচ্চ শক্তি বন্ধনী সৃষ্টি করে নিজের দেহে সঞ্চয় করে রাখে।

প্লাস্টিড (Plastid) : সজীব উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার, গ্রানা ও স্ট্রোমা সমৃদ্ধ, লিপো-প্রোটিন যুক্ত দ্বি-স্তরী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত, বর্ণযুক্ত বা বর্ণহীন, বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট যে সকল কোষ অঙ্গাণু উদ্ভিদের খাদ্য সংশ্লেষ, খাদ্য সঞ্চয় ও বর্ণ গঠনে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে প্লাস্টিড বলে।

প্লাস্টিডের আবিষ্কার (Discovery of plastid) : বিজ্ঞানী হেকেল (Haeckel) ১৮৬৬ সালে সর্বপ্রথম প্লাস্টিড শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৮৮৩ সালে শিম্পার (W. Schimper) সর্বপ্রথম উদ্ভিদকোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড আবিষ্কার করেন এবং ক্লোরোপ্লাস্টিড নামকরণ করেন। বিজ্ঞানী মেয়ার ১৮৮৩ সালে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিডকে অটোপ্লাস্ট ও অন্তবর্ণের প্লাস্টিডকে ট্রোফোপ্লাস্ট রূপে বর্ণনা করেন। বিজ্ঞানী মেয়েন ১৯২৩ সালে উদ্ভিদকোষে প্লাস্টিডের অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন।

প্লাস্টিডের অবস্থান (Position of plastid) : ছত্রাক, মিক্সোমাইসেটিস ও অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্য সব উদ্ভিদকোষে প্লাস্টিড বিদ্যমান। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় প্রমাণিত হয়েছে সালোকসংশ্লেষী ব্যাকটেরিয়া এবং নীলাভ সবুজ শৈবালেও ক্রোমাটোফোর নামক রঞ্জক বহনকারী অঙ্গাণু বিদ্যমান।

প্লাস্টিডের প্রকারভেদ (Type of plastid) : উদ্ভিদকোষের গঠন ও কাজের ওপর প্লাস্টিডের গঠন ও কাজ নির্ভর করে। প্লাস্টিড প্রধানত তিন প্রকার; যথা- ১। লিউকোপ্লাস্ট (leucoplast), ২। ক্রোমোপ্লাস্ট (chromoplast) ও ৩। ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast)। প্লাস্টিডগুলোর মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১। লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) : বর্ণহীন (leucos = বর্ণহীন) প্লাস্টিডগুলিকে লিউকোপ্লাস্ট বলে। কোনো প্রকার রঞ্জক পদার্থ না থাকায় এদের বর্ণহীন দেখায়। উদ্ভিদের যে সব অঙ্গে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেখানে লিউকোপ্লাস্ট থাকে। তবে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এরা রঞ্জক পদার্থ ধারন করে ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

অবস্থান : মূল, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি অর্থাৎ যে সব অঙ্গে সূর্যের আলো পৌছায় না সে সব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট অবস্থিত।

আকার-আকৃতি : এরা সাধারণত অর্ধবৃত্তাকার, মূলাকৃতি বা নলাকৃতির হতে পারে।

প্রকারভেদ : সঞ্চিত খাদ্যের ওপর ভিত্তি করে এদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) অ্যামাইলোপ্লাস্ট (Amyloplast) : স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে অ্যামাইলোপ্লাস্ট বলে। যেমন- গোলআলু।

(খ) ইলায়োপ্রাস্ট (Elaioplast) : চর্বি জাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে ইলায়োপ্রাস্ট বলে। যেমন- ভুট্টা বীজ।

(গ) অ্যালিউরোপ্লাস্ট (Aleuroplast) : প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে অ্যালিউরোপ্লাস্ট বলে। যেমন- সূর্যমুখীর বীজ।

লিউকোপ্লাস্টের কাজ : খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং শর্করা থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করা এদের প্রধান কাজ।

২। ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) : গ্রিকশব্দ chrome = রঙ্গিন এবং plast = living থেকে ক্রোমোপ্লাস্ট শব্দের উৎপত্তি। উদ্ভিদদেহে সবুজ ছাড়া অন্য যেকোন বর্ণ ধারণকারী প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলা হয়। ক্যারোটিন (কমলা-লাল) এবং জ্যান্থোফিল (হলুদ) পিগমেন্ট এর জন্য এরা রঙ্গিন হয়। এরা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গে থেকে বর্ণবৈচিত্র্য সৃস্টি করে। যেমন- ফুলের পাপড়ি, রঙ্গিন ফুল ও বীজ ইত্যাদি।

প্রকারভেদ : রঞ্জকের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে ক্রোমোপ্লাস্ট নিম্নলেখিত প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

(ক) রোডোপ্লাস্ট (Rhodoplast) : ফাইকোএরিথ্রিন নামক লাল রঞ্জকযুক্ত প্লাস্টিডকে রোডোপ্লাস্ট বলে। লোহিত শৈবালে এই প্রকার প্লাস্টিড পাওয়া যায়।

(খ) ফিয়োপ্লাস্ট (Phaeoplast) : ফাইকোজ্যানথিন নামক হলুদ-বাদামী রঞ্জকযুক্ত প্লাস্টিডকে ফিয়োপ্লাস্ট বলে। বাদামী শৈবাল, *Diatom* জাতীয় শৈবালে এই প্লাস্টিড পাওয়া যায়।

(গ) জ্যান্থোপ্লাস্ট (Xanthoplast) : জ্যান্থিন নামক হলুদ রঞ্জকযুক্ত প্লাস্টিডকে জ্যান্থোপ্লাস্ট বলে। এই প্লাস্টিড পাকা ফলের ত্বকের কোষে পাওয়া যায়।

(ঘ) ক্যারোটিনোপ্লাস্ট (Carotinoplast) : ক্যারোটিনয়েড নামক কমলা রঞ্জকযুক্ত প্লাস্টিডকে ক্যারোটিনোপ্লাস্ট বলে। গাজরের কোষে এই প্লাস্টিড পাওয়া যায়।

কাজ : ক্রোমোপ্লাস্টের উপস্থিতির জন্য ফুল ও পাতা রঙ্গিন ও সুন্দর হয় তাই কীটপতঙ্গ সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পরাগায়নে সাহায্য করে। রঙের কারণে ফল ও বীজের বিস্তারে [illegible]

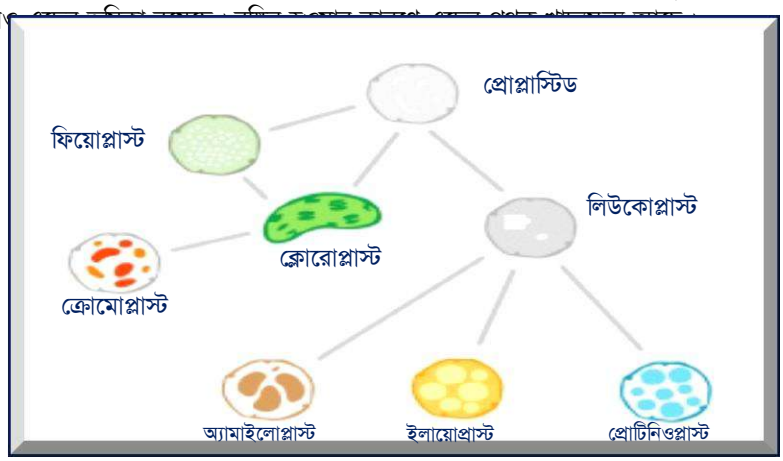

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিড

৩। ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) : গ্রিকশব্দ chloro = সবুজ, plast = living। উদ্ভিদ দেহে বিদ্যমান দ্বিস্তরী পর্দা দ্বারা আবৃত সবুজ বর্ণ প্রদানকারী, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপাদনকারী এবং স্থৈতিক রাসায়নিক শক্তি উৎপন্নকারী কোষ অঙ্গাণুকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে।

উদ্ভিদের পাতায় সবুজ বর্ণের ক্লোরোপ্লাস্ট অধিক পরিমানে উপস্থিত থাকে। এতে ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা বেশী থাকে বলে এরা সবুজ বর্ণের হয়। ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞানী Schimper সর্বপ্রথম উদ্ভিদকোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড লক্ষ্য করেন এবং এর নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোপ্লাস্ট খাদ্য সংশ্লেষে সাহায্য করে বলে একে কোষের রান্নাঘর (kitchen of cell) বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা (factory of synthesis of sugar) বলে। এটি শক্তি রুপান্তরের অঙ্গাণু।

ক্লোরোপ্লাস্টের উৎপত্তি (Origin of chloroplast) : নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্টের বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের উৎপত্তি হয়। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে আদি প্লাস্টিড হতে এদের উৎপত্তি হয়। আদি প্লাস্টিড সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সৃষ্টির সাথে সাথে পূর্ণাঙ্গ ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হতে থাকে। কিছুদিন সূর্যালোক না পেলে ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়, তাই সবুজ অংশ বর্ণহীন হয়।

ক্লোরোপ্লাস্টের অবস্থান ও সংখ্যা (Number & situation of chloroplast) : অন্যান্য রঞ্জক থাকলেও ক্লোরোফিলের আধিক্যের কারণেই ক্লোরোপ্লাস্টের রং সবুজ হয়ে থাকে। কিছু শৈবালের কোষে (*Chlamydomonas, Ulothrix, Chloralla* প্রভৃতি) সাধারণত একটিমাত্র ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। *Spirogyra rectospoya* শৈবালে ১৬টি ও *Chara* শৈবালে কয়েকশ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্ট মূলত গাছের পাতায়, কচি কাণ্ডত্বকে, ফুলের বৃতিতে এবং কচি ফলের ত্বকের কোষে অবস্থান করে। ষাধারণত যে সমস্থ কোষ-কলাতে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে, সেসব কলা কোষে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। এছাড়াও বীজের মধ্যে ভ্রূণে এবং বড় গাছের প্যারেনকাইমা কলার কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায়। পাতার মেসোফিল কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট বেশি পাওয়া যায়। *Ricinus communis* উদ্ভিদের পাতায় প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ৪০০০০ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। C_4 উদ্ভিদে গ্রানাযুক্ত ও গ্রানাবিহীন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে এবং C_3 উদ্ভিদে কেবল গ্রানাযুক্ত ক্লোরোপ্লাস্টই থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি (Shape of chloroplast) : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি সাধারণত লেন্সের মতো হয়। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদকোষে এদের আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন- পেয়ালাকৃতি (*Chlamydomonas*), সর্পিলাকার (*Spirogyra*), তারকাকার (*Zygnema*), জালিকাকার (*Oedogonium*), আংটি আকার (*Ulothrix*), গোলাকার (*Pithophora*) ইত্যাদি।

ক্লোরোপ্লাস্টের আকার (Size of chloroplast) : লেন্স আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্টের ব্যাস ৩.৫ um। *Spirogyra*-র সর্পিলাকার ক্লোরোপ্লাস্টের সোজা অবস্থায় কোষের দৈঘ্য অপেক্ষাও অধিক লম্বা হয়।

ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন (Structure of Chloroplast) : ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন বেশ জঠিল। ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণযন্ত্রের সহায়তায় পর্যবেক্ষণ করলে ক্লোরোপ্লাস্টে নিম্নে বর্নিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

১। আবরণী (Membrane) : প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্ট লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত দুটি একক পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। বাইরের পর্দাটিকে বহি :পর্দা এবং ভেতরেরটিকে অন্ত :পর্দা বলে। দুটি পর্দার মাঝে যে স্থান থাকে তাকে পেরিপ্লাস্টিডিয়াল স্পেস (periplastidial space) বলে। বহি :পর্দাটি মসৃণ ও ভেদ্য কিন্তু অন্ত :পর্দাটি বৈষম্যভেদ্য। আবরণটি ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরস্থ নানাবিধ বস্তুসমুহকে রক্ষা করে এবং ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে-বাইরে নানাবিধ বস্তুর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে। বহি :পর্দাটি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে ও অন্ত :পর্দাটি থাইলাকয়েডের সাথে যুক্ত থাকে।

২। স্ট্রোমা (Stroma) : দ্বিস্তরী আবরণী দ্বারা আবৃত ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে যে স্বচ্ছ, দানাদার, অর্ধতরল, জেলিসদৃশ অসমসত্ত্ব জলীয় অংশকে স্ট্রোমা বলা হয়। লিপোপ্রোটিন ও কিছু এনজাইম দিয়ে স্ট্রোমা গঠিত। স্ট্রোমা গ্রানার ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স (matrix) হিসেবে কাজ করে। এর ম্যাট্রিক্সে অবস্থিত DNA প্রধানত চক্রাকার ও দ্বিস্তরী। ক্লোরোপ্লাস্টের ম্যাট্রিক্সে অবস্থিত DNA এর রেপ্লিকেশন ও ট্রান্সক্রিপশন ঘটে। স্ট্রোমাতে 70S রাইবোজোম, অসমোফিলিক দানা, DNA, RNA ইত্যাদি থাকে। এতে গ্লুকোজ তৈরির এনজাইম থাকে। সালোকসংশ্লেষণে কার্বন বিজারণের মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপাদন প্রক্রিয়া (C_3 বা C_4 প্রক্রিয়া) স্ট্রোমাতে ঘটে থাকে।

৩। থাইলাকয়েড ও গ্রানাম (Thylacoid and Granum) : স্ট্রোমার মধ্যে কতকগুলো চাকতির মতো বস্তু সহযোগে ৪০ - ৬০টি ঢাক-সদৃশ গঠন দেখা যায়। এরকম এক-একটি গঠনকে গ্রানাম (বহু-বচনে গ্রানা) বলে। প্রতিটি গ্রনামরে এক-একটি চাকতি সদৃশ বস্তুতে থাইলাকয়েড বা গ্রানাম ল্যামেলা বলে। থাইলাকয়েডকে ক্লোরোপ্লাস্টের গঠনগত ও কার্যগত একক বলা হয়। থাইলাকয়েডের একক পর্দার ভেতরে যে সুক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক দানা থাকে তাদেরকে কোয়ান্টাজোম (quantasome) বলে। বর্তমানে কোয়ান্টাজোমকে সালোকসংশ্লেষীয় একক (photosynthetic unit) বলে। থাইলাকয়েড পর্দায় PS-I, PS-II বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহক, ATPase এনজাইম থাকে। প্রতিটি থাইলাকয়েড দ্বিস্তরী পর্দা দ্বারা আবৃত। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গ্রানা কিছুসংখ্যেক সুক্ষ্ম নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে। সংযোগ সাধনকারী এসব নালীকে স্ট্রোমা ল্যামেলী (একবচনে স্ট্রোমা ল্যামেলাম) বলে। থাইলাকয়েডে ফটোসিস্টেম আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

৪। ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও ATP-synthases (Photosynthetic unit & ATP-synthases) : থাইলাকয়েড মেমব্রেন বহু গোলাকার বস্তু বহন করে। থাইলাকয়েড মেমব্রেনের ভেতরের গাত্রে অসংখ্য সালোকসংশ্লেষণকারী একক ও ATP সিন্থেসেস নামক বস্তু থাকে। ATP সিন্থেসেস নামক বস্তুতে ATP তৈরির সকল এনজাইম থাকে। মেমব্রেনগুলোতে অসংখ্য সালোকসংশ্লেষীয় একক (photosynthetic unit) থাকে। প্রতি ইউনিটে ক্লোরোফিল-এ, ক্লোরোফিল-বি, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল এর প্রায় ৩০০ - ৪০০টি অণু থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, মেটাল আয়ন, ফসফোলিপিড, কুইনোন ইত্যাদি থাকে।

৫। DNA ও রাইবোজোম (DNA & Ribosome) : সর্বপ্রথম স্টকিং (Stocking) ১৯৬০ সালে *Spirogyra* উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে DNA থাকার প্রমাণ পান। একটি ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সমান আকৃতির প্রায় ২০০টি DNA অণু থাকতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্টের মাতৃকায় উপস্তিত DNA নগ্ন, চক্রাকার কখনো কখনো রেখাকার হয়। ক্লোরোপ্লাস্টের রাইবোজোম 70S প্রকৃতির হয়। এগুলো যথাক্রমে ক্লোরোপ্লাস্টের নিজস্ব প্রতিরূপ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষ করে থাকে।

চিত্র : ক্লোরোপ্লাস্টের সুক্ষ্ম গঠন

ক্লোরোপ্লাস্টের রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure of Chloroplast) : রাসায়নিকভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট মুলত কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন, ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েড (ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল) DNA, RNA, কিছু এনজাইম ও কো-এনজাইম এবং খনিজ অণু নিয়ে গঠিত। প্রোটিনের মধ্যে ৮০% হচ্ছে অদ্রবণীয় যা লিপিডের সাথে একত্রে ঝিল্লি নির্মাণ করে, বাকি ২০% দ্রবনীয় এবং এনজাইম হিসেবে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টে রয়েছে ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা। এর ৭৫% ক্লোরোফিল$_a$ ও ২৫% ক্লোরোফিল$_b$

ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ (Function of chloroplast) :

১। সালোসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করা ক্লোরোপ্লাস্টের প্রধান কাজ।

২। এর গ্রানা অঞ্চলে সালোসংশ্লেষণের আলোক পর্যায় এবং স্ট্রোমা অঞ্চলে অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

৩। প্রয়োজনে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড তৈরি করে।

৪। সালোক-শ্বসন (photorespiration) ঘটাতে সাহায্য করে।

৫। সূর্যালোকের সাহায্যে ADP-কে ATP-তে রূপান্তর করে।

৬। এর ম্যাট্রিক্সে DNA থাকায় এটি সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্সে সাহায্য করে।

ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্টের মধ্যে পার্থক্য
(Differences between chloroplasts, chromoplasts and leukoplasts) :

পার্থক্যের বিষয়	লিউকোপ্লাস্ট (leukoplasts)	ক্রোমোপ্লাস্ট (chromoplasts)	ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplasts)
১। বর্ণ	এরা বর্ণহীন।	এরা রঙ্গিন।	এরা সবুজ।
২। অবস্থান	মূল, ভূনিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি যেসব অঙ্গে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেসব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট বিদ্যমান।	উদ্ভিদের যেসব অঙ্গ বর্ণময় যেমন- ফুলের পাপড়ি, রঙ্গিন ফল ও বীজ গাজরের মূল ইত্যাদিতে ক্রোমোপ্লাস্ট বিদ্যমান।	উদ্ভিদের সবুজ অংশ যেমন- পাতা, কচি কাণ্ড ইত্যাদিতে ক্লোরোপ্লাস্ট বিদ্যমান।
৩। রঞ্জক	রঞ্জক থাকে না।	প্রধান রঞ্জক ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল।	প্রধান রঞ্জক ক্লোরোফিল।
৪। উৎপত্তি	এরা সূর্যালোকের উপস্থিতে ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়।	সূর্যালোকের উপস্থিতে ক্লোরোপ্লাস্ট হতে ক্রোমোপ্লাস্ট সৃষ্টি হয়।	সূর্যালোকের অনুপস্থিতে লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়। অর্থাৎ সবুজ অঙ্গ বর্ণহীন হয়ে যায়।
৫। থাইলাকয়েড	থাইলাকয়েড থাকে না।	থাইলাকয়েড থাকে না।	থাইলাকয়েড থাকে।
৬। রূপান্তর	অন্য প্লাস্টিডে রূপান্তরিত হতে পারে।	রূপান্তরিত হতে পারে না।	রূপান্তরিত হতে পারে।
৭। কাজ	খাদ্য সঞ্চয় করা এবং শর্করা থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করা।	ফুলের পরাগায়ন এবং ফল ও বীজ বিস্তারে সাহায্য করে।	সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা।

নিউক্লিয়াস (Nucleus) : গ্রিকশব্দ nux অর্থ nut থেকে nucleus শব্দের উৎপত্তি। প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত সবচেয়ে গাঢ়, ঘন, গোলাকার বা উপবৃত্তাকার, দ্বিস্তর বিশিষ্ট একক পর্দা দ্বারা আবৃত যে অঙ্গাণুটি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, তাকে নিউক্লিয়াস বলে।

কোষের সকল প্রকার বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবদ্ধ করে বলে একে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয়। নিউক্লিয়াস কোষের একটি অপরিহার্য অংশ। উদ্ভিদের পরিনত সীভ কোষ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণির লোহিত কণিকা ছাড়া সমস্ত প্রকৃত কোষে নিউক্লিয়াস থাকে। পূর্বে অবস্থিত মাতৃ নিউক্লিয়াস থেকে নতুন অপাত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়।

নিউক্লিয়াসের আবিষ্কার ও নামকরণ (Discovery and nomencluture of nucleus) : বিজ্ঞানী লিউয়েনহুক সর্বপ্রথম মাছের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস পর্যবেক্ষণ করেন। ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) ১৮৩১ সালে রান্নার (এক প্রকার অর্কিড) পাতার কোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্গার ১৮৮২ সালে নিউক্লিওপ্লাজম সম্পর্কে ধারনা দেন। বিজ্ঞানী জে হ্যামারলিং ১৯৫৩ সালে নিউক্লিয়াসের বংশগত বৈশিষ্ট্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

নিউক্লিয়াসের অবস্থান ও আয়তন (Situation and volume of nucleus) : নিউক্লিয়াস সাধারণত কোষের মধ্যভাগে অবস্থান করে। কিন্তু কোষে এক বা একাধিক গহবরের কারণে নিউক্লিয়াস কোষের পরিধির দিকে চলে আসে। গোলাকার নিউক্লিয়াসের ব্যাস এক মাইক্রোন হয়। নিউক্লিয়াসের আয়তন ছোট বা বড় হতে পারে। সাধারণত এটি কোষের ১০ - ১৫% স্থান দখল করে থাকে; তবে শুক্রাণুর ক্ষেত্রে প্রায় ৯০% স্থান দখল করে থাকে। কোষের অবস্থা, বিপাকীয় প্রকৃতি, ক্রেমোজোম সংখ্যা (n, 2n, 3n) প্রভৃতির উপর নিউক্লিয়াসের অবস্থান ও আয়তন নির্ভর করে।

নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ও আকৃতি (Number and shape of nucleus) : প্রতি কেষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। *Vaucheria, Botrydium, Sphaeroplea* প্রভৃতি শৈবাল এবং *Penicillium*-সহ কতিপয় ছত্রাক কোষে বহুসংখ্যেক নিউক্লিয়াস দেখা যায়। বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এ ধরনের কোষকে সিনোসাইট (coenocyte) বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিউক্লিয়াস গোলাকার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকার, চাকতি-সদৃশ অথবা শাখান্বিত নিউক্লিয়াসও দেখা যায়। শ্বেত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াসের কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না। আদিকোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না।

নিউক্লিয়াসের ভৌত গঠন (Physical structure of nucleus) : নিউক্লিয়াসের ভৌত গঠন পর্যবেক্ষণের প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে কোষ বিভাজনের পূর্ব মুহূর্ত। কোষ বিভাজনের পূর্ব মুহূর্তে ইন্টারফেজ দশায় একটি সুস্থিত নিউক্লিয়াসে চারটি প্রধান অংশ থাকে। যথা- ১। নিউক্লিওপর্দা (nuclear membrane), ২। নিউক্লিওপ্লাজম (nucleoplasm), ৩। নিউক্লিওলাস (nucleolus) এবং ৪। নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু (nuclear reticulum or chromatin fibre)।

১। নিউক্লিওপর্দা (Nuclear membrane) : যে সজীব ও দ্বিস্তরী পর্দা দ্বারা প্রতিটি নিউক্লিয়াস আবৃত থাকে, তাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলে। এর বহিঃস্তরে অসংখ্য ছিদ্র বিদ্যমান কিন্তু অন্তঃস্তরটি ছিদ্রবিহীন। এসব ছিদ্রকে নিউক্লীয় রন্ধ্র বলা হয়। ছিদ্রের ব্যাস ৯ ন্যানোমাইক্রোন। প্রতিটি রন্ধ্রের অভ্যন্তরে ৮টি বৃত্তাকার কণা অবস্থিত। এসব কণার উপস্থিতির কারণে রন্ধ্রগুলো সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। বহিঃস্তর ও অন্তঃস্তরের মাঝের স্তরকে পেরিনিউক্লিয়ার স্তর বা পেরিনিউক্লিয়ার সিস্টারনি বলে। রাসায়নিকভাবে মেমব্রেনটি বিশুদ্ধ প্রোটিন দিয়ে গঠিত। বহিঃস্তর রাইবোজোমযুক্ত এমনকি অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যুক্ত থাকতে পারে।

নিউক্লিওপর্দার কাজ (Function of nuclear membrane) :

(ক) ইহা সাইটোপ্লাজম হতে নিউক্লিওপ্লাজম, নিউক্লিওলাস এবং ক্রোমাটিন জালিকাকে পৃথক রাখে এবং সংরক্ষণ করে।

(খ) অভ্যন্তরীণ দ্রব্য ও বহি :স্ত সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও পরিবহন করা।

(গ) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াসের অবস্থানকে দৃঢ় করে।

(ঘ) নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm) : নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দ্বারা আবৃত স্বচ্ছ, দানাদার ও জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থকে নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিম্ফ বলে। এটি নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমিক রস। প্রোটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্যসমূহ এতে বিদ্যমান। নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোজোম এতে অবস্থান করে। এটি মূলত প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এছাড়া এতে RNA, বিভিন্ন এনজাইম, RNP দানা, অল্প পরিমাণে লিপিড ও কিছু খনিজ পদার্থ বিদ্যমান।

নিউক্লিওপ্লাজমের কাজ (Function of nucleoplasm) :

(ক) ইহা ক্রোমাটিন জালিকা ও নিউক্লিওলাস ধারণ করে।

(খ) নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন জৈবনিক কাজে সাহায্য করে।

(গ) এনজাইমের কার্যকলাপের মূল ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় ব্যবহারযোগ্য খাদ্য সঞ্চিত করে রাখে।

(ঙ) নিউক্লিয়াসের রসস্ফীতি অবস্থা বজায় রাখে।

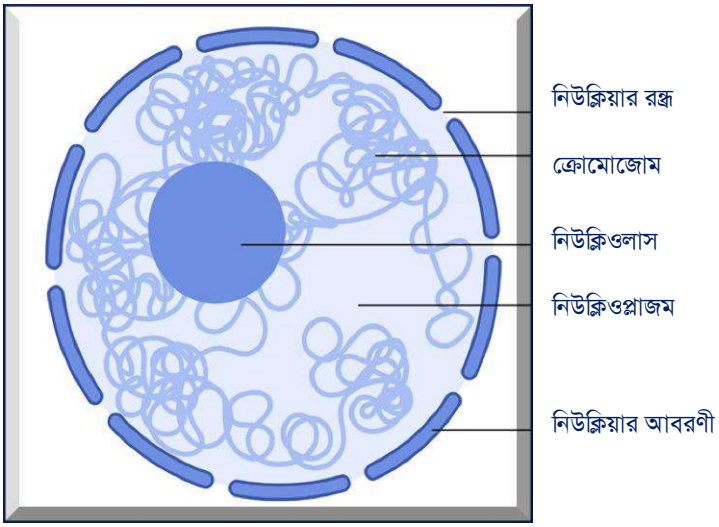

চিত্র : নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ

৩। নিউক্লিওলাস (Nucleolus) : নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র, গোলাকার, উজ্জ্বল ও অধিকতর ঘন বস্তুটিকে নিউক্লিওলাস বলে। বিজ্ঞানী ফন্টানা (Fontana) ১৭৮১ সালে সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে এটি দেখতে পান এবং ১৮৪০ সালে বোম্যঅন (Bowman) এর নামকরণ করেন।

অবস্থান (Location) : নিউক্লিওলাস সাধারণত নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে লাগানো থাকে। ক্রোমোজোমের যে স্থানটিতে এটি লাগানো থাকে সে স্থানটিকে বলা হয় SAT বা স্যাটেলাইট।

সংখ্যা (Numbers) : প্রতি নিউক্লিয়াসে সাধারণত একটি নিউক্লিওলাস থাকে। সাধারণত যে সব কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় না সে সব কোষের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওলাস থাকে না। কিন্তু যে সব কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ বেশী পরিমানে হয় সে সব কোষের নিউক্লিয়াসে একাধিক নিউক্লিওলাস থাকতে পারে।

উৎপত্তি (Origin) : SAT ক্রোমোজোমের স্যাটেলাইটে অবস্থিত জিন নিউক্লিওলাস উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ভৌত গঠন (Physical structure) : এর কোনো ঝিল্লি আবিষ্কৃত হয়নি। নিউক্লিওলাসকে সাধারণত তন্তুময়, দানাদার ও ম্যাট্রিক্স-এ তিন অংশে ভাগ করা যায়।

রাসায়নিক গঠন (Chemical composition) : নিউক্লিওলাসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন, RNA এবং অল্প পরিমানে DNA।

নিউক্লিওলাসের কাজ (Function of nucleolus) :

(ক) নিউক্লিওলাস নিউক্লিক এসিড-এর ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

(খ) রাইবোজোম সৃষ্টি করে।

(গ) প্রোটিন ও RNA সংশ্লেষ ও সংরক্ষণ করে।

(ঘ) ক্রেমোজোমাল চলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪। নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু (Nuclear reticulum or chromatin fiber) : কোষ বিভাজনের ইন্টারফেজ দশায় নিউক্লিওপ্লাজমে উপস্থিত, নিউক্লিওপ্রোটিন নির্মিত যে সূত্রাকার অঙ্গাণুগুলি ক্ষারীয় রঞ্জকে রঞ্জিত হয় তাকে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু বলা হয়।

নিউক্লিয়াসের বিভাজনরত অবস্থায় যে অংশ ফুলজিন রং নিয়ে রঞ্জিত হয় সেই অংশকে বলা হয় ক্রোমাটিন। কোষ বিভাজন অবস্থায় ক্রোমাটিন তন্তু ক্রমাগত কুন্ডলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা হয়, তখন এদের পৃথক পৃথক ভাবে সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় দৃশ্যমান হয়। তখন এদেরকে ক্রোমোজোম (chromosome) বলে। এটি বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। এটি প্রচুর DNA, সামান্য RNA, হিস্টোন ও নন হিস্টোন প্রোটিন, লিপিড, এনজাইম এবং Ca, Mg সহ নানা প্রকার ধাতব আয়ন দিয়ে গঠিত। প্রতিটি ক্রোমোজোম এক বা একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার, দুটি ক্রোমাটিড এবং কোনো কোনো ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে। ক্রোমোজোমে জিন অবস্থিত এবং এ জিনগুলোই প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী।

নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তুর কাজ (Function of the nuclear reticulum or chromatin fiber) :

(ক) ক্রোমাটিন তন্তু বংশগতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে।

(খ) mRNA সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রোটিনের বার্তা প্রেরণ করে।

ক্রোমোজোম (Chromosome) : ইউক্যারিওটিক কোষস্থ নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অনুলিপন ক্ষমতাসম্পন্ন, ক্ষারীয় রঞ্জক ধারণকারী এবং নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যে সব সূত্রাকৃতির ক্ষুদাঙ্গ বংশগতীয় উপাদান, মিউটেশন, প্রকরণ প্রভৃতি কাজে বিশেষ ভুমিকা পালন করে তাদেরকে ক্রোমোজোম বলে।

ক্রেমোজোম নিউক্লিয়াসের অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যেক ক্রোমোজোম থাকে। সাধারণত একই প্রজাতির বিভিন্ন নমুনায় ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে। আদিকেষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না তাই সুগঠিত কোনো ক্রোমোজোমও থাকে না। প্রতিটি ক্রোমোজোম ত্বকীয় গঠন ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভাজনে সক্ষম ও বংশানুক্রমে অপরিবর্তনশীল। এরা বংশগতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে।

আবিষ্কার ও নামকরণ (Discover & nomenclature of chromosome) : গ্রিকশব্দ chroma অর্থ colour (বর্ণ) এবং soma অর্থ body (দেহ)। কাজেই ক্রোমোজোম অর্থ হলো রঞ্জিত দেহ বা রংধারণকারী দেহ। কারণ এরা কতগুলো বেসিক রং ধারণ করতে পারে।

Karl Nagli ১৮৪২ সালে সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম প্রত্যক্ষ করেন। E. Strasburger ১৮৭৫ সালে কোষ বিভাজনের সময় সুতার মতো কিছু গঠন লক্ষ্য করেন। Walter Flemming ১৮৮৮ সালে এসব সূতার মতো গঠনগুলোকে ক্রোমাটিন (chromatin) নামকরণ করেন। বর্ণধারন ক্ষমতার জন্য W. Waldeyer ১৮৮৮ সালে এদের ক্রোমোজোম নামকরণ করেন। Sutton & Boveri ১৯০২ সালে ক্রোমোজোমকে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসেবে বর্ণনা করেন। Painter ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

ক্রোমোজোম সংখ্যা (Number of chromosome) : জীবজগতের যে কোনো প্রজাতিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল। প্রজাতিভেদে ডিপ্লয়েড প্রকৃত কোষে ২টি থেকে ১৬০০টি ক্রোমোজোম থাকতে পারে। পুষ্পক উদ্ভিদে সর্বনিম্ন সংখ্যেক ক্রোমোজোম পাওয়া গিয়েছে *Haplopappus gracilis*, 2n = ৪ এবং সর্বাধিক সংখ্যেক *Ophioglossum reticulatum* নামক ফার্ণে 2n = ১২৬০। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এখনো সমস্ত জীবজগতের ১০ ভাগও ক্রোমোজোম গণনাকরা সম্ভব হয়নি।

ক্রোমোজোমের আয়তন ও আকৃতি (Size & volume of chromosome) : সাধারণত প্রতিটি প্রজাতির জীবে ক্রোমোজোমের একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন ও আকৃতি থাকে। সাধারণত ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য ০.২ – ৫০ um এবং ব্যাস ০.২ – ২০ um হয়ে থাকে। ভট্টা উদ্ভিদে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য ৮ - ১২ um। উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ক্রোমোজোপ্রাণিম *Trillium* উদ্ভিদে দেখা যায় এবং এর দৈর্ঘ্য ৩২ um হয়ে থাকে।

কতিপয় উদ্ভিদ ও প্রাণির বৈজ্ঞানিক নামসহ ক্রোমোজোম সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

উদ্ভিদের নাম (Plant name)	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)	ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n)	প্রাণির নাম (Animal name)	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)
ধান	*Oryza sativa*	24	মানুষ	*Homo sapiens*
গম	*Triticum aestivum*	42	গরু	*Boss indica*
ভুট্টা	*Zea mays*	20	ছাগল	*Capra hircus*
পিঁয়াজ	*Allium cepa*	16	কবুতর	*Columba livia*
শসা	*Cucumis sativas*	14	সোনাব্যাঙ	*Rana pipiens*
গোল আলু	*Solanum tuberasum*	48	খরগোশ	*Oryctolagus cuniculus*
টমেটো	*Lycopersicon esculentum*	24	গরিলা	*Gorilla gorilla*
তামাক	*Nicotiana tabacum*	28	গিনিপিগ	*Cavia porcellus*
পেঁপে	*Carica papaya*	18	গৃহমাছি	*Musca domestica*
বাঁধাকপি	*Brassica oleracea*	18	ফলের মাছি	*Drosophila melanogaster*
পাট	*Corchorus capsularis*	14	কিউলেক্স মশা	*Culex pipines*
মূলা	*Raphanus sativus*	18	গোলকৃমি	*Ascaris megalocephalus*
চীনাবাদাম	*Arachis hypogaea*	40	রেশম পোকা	*Bombyx mori*

ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন (Physical Structure of Chromosome) : ক্রোমোজোমের গঠন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। কোষে স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা পৃথকভাবে দেখা যায় না। কোষচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের আকার, আকৃতি ও গঠনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো স্থূল, প্যাচানো ও দন্ডাকার সূত্র হিসেবে পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তাই, ক্রোমোজোমের আঙ্গিক গঠন পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সময় মেটাপেজ ধাপ। জঠিল (যৌগিক) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি আদর্শ ক্রোমোজোমে নিম্নোক্ত অংশগুলো দেখা যায়।

১। ক্রোমাটিন (Chromatin) : ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোম মূলত DNA ও হিস্টোন প্রোটিন কমপ্লেক্স দ্বারা গঠিত এবং এর সুক্ষ্ম তন্তুময় অংশকে ক্রোমাটিন তন্তু বলে। বিভাজন অবস্থা ছাড়া সাধারণত ক্রোমাটিন নিউক্লিয়াসে জালকের মতো বিস্তৃত থাকে বলে একে ক্রোমাটিন জালিকা বলা হয়। ক্রোমোজোমের মূল উপাদান হলো ক্রোমাটিন (রঞ্জিত সূত্রাকার দেহ) যা প্রকৃতপক্ষে DNA প্রোটিন যৌগ। হিস্টোন প্রোটিন কেন্দ্রিয় কণা (core article) গঠন করে এবং ঐ কেন্দ্রিয় কণাকে বেস্টন করে DNA এমনভাবে অবস্থান করে যে, ক্রোমাটিন তন্তুতে সুতার উপর সারিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট দুরত্ব অন্তর পুতির দানার মতো (bead structure on a string) দেখায়। কেন্দ্রিয় প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত DNA অণুকে একসাথে নিউক্লিওপ্লাজম (nucleosome) বলে।

ইন্টারফেজ ও প্রোফেজ পর্যায়ে ক্রোমাটিনের যে অংশ অধিক কুন্ডলিত থাকে তাকে হেটোরোক্রোমাটিন বলে। এ অংশ বংশানুস্মৃতিতে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকে। mRNA সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে না। অপরদিকে ক্রোমাটিনের যে অংশ কম কুন্ডলিত থাকে তাকে ইউক্রোমাটিন বলে। এ অংশ বংশানুস্মৃতিতে সক্রিয় থাকে। এটি ক্রোমোজোমের বিস্তৃত অংশ এবং mRNA সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

২। ক্রোমাটিড (Chromatid) : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রফেজ দশায় ক্রোমোজোম প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় এবং মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোজোমকে লম্বালম্বিভাবে দুটি অংশে বিভক্ত হতে দেখা যায় যার প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমোজোমে সমান ও সমান্তরাল একজোড়া ক্রোমাটিড থাকে। এরা সিস্টার (sister) ও নন-সিস্টার (non-sister) এই দুই ধরনের হয়ে থাকে। ক্রোমাটিড দুটি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যুক্ত থাকে। আধুনিক ধারনা অনুযায়ী ক্রোমাটিড একটি একক DNA অণু দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানী Vejdovsky ১৯২১ সালে এদের ক্রোমোনেমাটা (একবচন-ক্রোমোনেমা) নামে অভিহিত করেন।

৩। সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) : সেন্ট্রোমিয়ার শব্দটি Kentron = কেন্দ্র ও meros = অংশ, এই দু'টি শব্দ নিয়ে গঠিত। এটি ক্রোমোজোমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুটি ক্রোমাটিড যে গোলাকার, বর্ণহীন ও সংকুচিত বিন্দুতে যুক্ত থাকে তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। সিস্টারক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানটি ক্রোমোজোমে একটি খাঁজের সৃষ্টি করে। এ খাঁজকে বলা হয় মুখ্যকুঞ্চন বা primary constriction। আদর্শ ক্রোমোজোমে একটিমাত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। অস্বাভাবিক অবস্থায় একটি ক্রোমোজোমে ২টি বা অধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোজোম অ্যাসেন্ট্রিক, মনোসেন্ট্রিক, ডাইসেন্ট্রিক, পলিসেন্ট্রিক ইত্যাদি প্রকারের হয়ে থাকে। অ্যানাফেজ দশায় মেরুমুখী চলনে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে।

৪। বাহু (Arm) : সেন্ট্রোমিয়ার-এর দুপাশের ক্রোমোজোমাল অংশকে বাহু বলা হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোমের দু'টি বাহু থাকে। তবে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে ১টি বাহু থাকে। বাহু দু'টি সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বা অসম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হতে পারে। ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বাহু দুটির দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট হয়।

৫। কাইনেটোকোর (Kinetochore) : দ্বিপ্রস্থ ক্রোমোজোমের গঠনে প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ারের পাশে প্রোটিন নির্মিত, গোলাকার চাকতির মতো একটি গাঠনিক অংশ থাকে যা কাইনেটোকোর (kinetochore) নামে পরিচিত। ইহা বাইরের ও ভেতরের দিকে দুটি প্লেট দিয়ে গঠিত। এতে মাইক্রোটিউবিউল সংযুক্ত থাকে। এটি স্পিন্ডল তন্তুর সাথে যুক্ত হয়ে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের অ্যানাফেজিক চলনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) : প্রতিটি ক্রোমোনেমা-এর দৈর্ঘ্য বরাবর স্থানে স্থানে DNA অণু কুন্ডলিত হয়ে নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের যে পুতির দানার মতো (bead like) অংশ গঠন করে তাকে ক্রোমোমিয়ার বলে। মিয়োসিসের প্রথম প্রফেজের প্যাকাইটিন উপদশায় ক্রোমোমিয়ারের সংখ্যা ও অবস্থান স্পষ্ট দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে হিস্টোন অক্টামার ও DNA দিয়ে গঠিত নিউক্লিওজোমগুলিই ক্রোমোমিয়ার রূপে দৃশ্যমান হয়।

৭। গৌণকুঞ্চন (Secondary constriction) : কোনো কোনো ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত প্রান্তবর্তী অংশে এক বা একাধিক কুঞ্চিত রংহীন অংশ দেখা যায়, একে গৌণকুঞ্চন বলে। এখানে DNA স্বল্পমাত্রায় কুন্ডলিত থাকে। গৌণকুঞ্চন নিউক্লিওলাস গঠনে ভূমিকা করে বলে একে নিউক্লিওলাস সংগঠকও (nucleolus organizer) বলা হয়।

৮। স্যাটেলাইট (Satellite) : কোনো কোনো ক্রোমোজোমের এক বাহুর প্রান্তে ক্রোমাটিন সূত্র দ্বারা সংযুক্ত প্রায় গোলাকৃতির একটি অংশ দেখখা যায়। ক্রোমোজোমের প্রান্তের দিকের এ গোলাকৃতি অঞ্চলকে স্যাটেলাইট এবং এ ধরনের ক্রোমোজোমকে স্যাট ক্রোমোজোম (sat chromosome) বলে। অন্যাভাবে নিউক্লিওলাস বহনকারী ক্রোমোজোমকে স্যাট ক্রোমোজোম বলে। তুলা, পাট, ছোলা ইত্যাদি উদ্ভিদের কোনো কোনো ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট আছে। ছোলার ১নং ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে।

৯। টেলোমিয়ার (Telemere) : স্যাট-ক্রোমোজোমের প্রান্তবর্তী DNA ও প্রোটিন নির্মিত অংশকে টেলোমিয়ার বলে। টেলোমিয়ারে পুনরাবর্তিক ক্ষারবিন্যাস দেখা যায় এবং একসূত্রে guanine ও অপরসূত্রে cytosine এর আধিক্য থাকে। টেলোমিয়ার ক্রোমোজোমের প্রান্তে গিটের মতো থাকে এবং অন্য ক্রোমোজোমের সাথে সংযুক্তি বন্ধ রাখে। এটি কোষের ইন্টারফেজ দশায় নিউক্লিওলাস হিসেবে নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রোটিন তৈরির প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে।

তবে আগে টেলোমিয়ারের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক ছিল। টেলোমিয়ার জীবের বয়োবৃদ্ধি অর্থাৎ বুড়িয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ তথ্য আবিষ্কারের জন্য ২০০৯ সালে Elizabeth Blacklom ও Caroll Grider নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১০। ম্যাট্রিক্স (Matrix) : ক্রোমাটিন সূত্রের চারদিকে পেলিকল দ্বারা আবৃত প্রোটিন ও RNA পদার্থের স্তরকে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা বলে। কোষ বিভাজন পর্যায়ে ম্যাট্রিক্স দ্রবীভূত হয়ে যায়। তবে আধুনিক গবেষণায় ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যাট্রিক্স এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি।

১১। পেলিকল (Pelicle) : ম্যাট্রিক্সসহ ক্রোমোজোমের বাইরে একটি পাতলা আবরণী কল্পনা করা হয়। একে পেলিকল বলে। তবে আধুনিক গবেষণায় ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পেলিকলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি।

চিত্র : ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশ

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure of Chromosome) : ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জঠিল। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে ক্রোমোজোম গঠিত। রাসায়নিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান।

১। নিউক্লিক এসিড (Nucleic Acid) : ক্রোমোজোমে দুই ধরনের নিউক্লিক এসিড পাওয়া যায়; যথা- (ক) DNA ও (খ) RNA।

(ক) DNA : DNA এর পুরা নাম Deoxyribo Nuleic Acid। DNA হলো প্রকৃত কোষের স্থায়ী উপাদান এবং বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি ক্রোমোজোমে DNA অণুটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অখন্ড ক্রোমোজোমের প্রায় ৪৫% শুধু DNA থাকে। এটি দ্বিসূত্রবিশিষ্ট পলি নিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির পরিপুরক। এত পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থায়োমিন ও সাইটোসিন) থাকে। বিজ্ঞানী সুইফট (১৯৬৪) এবং বোনার (১৯৬৮) এর মতে ক্রোমোজোমে DNA ও হিস্টোন প্রোটিনের অনুপাত হচ্ছে ১ : ১। জীবের প্রায় ৯০ ভাগ DNA ক্রোমোজোমে থাকে।

(খ) RNA : RNA-এর পুরা নাম Ribo Nucleic Acid। ক্রোমোজোমে এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ০.২ - ১।৪ ভাগ। RNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী উপাদান নয়। প্রতিটি RNA অণু সাধারণত একসুত্রবিশিষ্ট। এটি পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল ও সাইটোসিন দ্বারা গঠিত। অনেক ভাইরাস কোষে DNA এর পরিবর্তে RNA থাকে।

ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ (Types of Chromosome) : সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা, অবস্থান, দেহ গঠন ও লিঙ্গ নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রোমোজোম নিম্নলেখিত প্রকারের হতে পারে।

১। সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ (Types of chromosomes according to the number of centromeres) :

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোজোম নিম্নলেখিত পাঁচ প্রকার; যথা-

(ক) মনোসেন্ট্রিক (Monocentric) : এক সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অধিকাংশ প্রজাতিতে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখা যায়।

(খ) ডাইসেন্ট্রিক (Dicentric) : দুই সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। গমের কয়েকটি প্রজাতিতে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখা যায়।

(গ) পলিসেন্ট্রিক (Polycentric) : দুই এর অধিক সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। কলা গাছের কয়েকটি প্রজাতিতে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখা যায়।

(ঘ) ডিফিউজড (Diffused) : ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট স্থানে সুস্পষ্টভাবে কোনো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না।

(ঙ) অ্যাসেন্ট্রিক (Acentric) : এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের কোনো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না। তখন তাকে অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। কোষবিভাজনে এরা অংশগ্রহণ করে না। সদ্য ভঙ্গুরকৃত কোনো ক্রোমোজোমের অংশবিশেষ এ ধরনের হয়ে থাকে।

২। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ (Types of chromosomes according to the position of the centromere) : কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো বিভিন্ন আকৃতির হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোম নিম্নলেখিত চার ধরনের; যথা-

(ক) মধ্যকেন্দ্রিক (Metacentric) : যে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে মাঝখানে অবস্থিত তাকে মধ্যকেন্দ্রিক বা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এ ধরনের ক্রোমোজোমের দুটি বাহু সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয় এবং অ্যানাফেজ পর্যায়ে ইংরেজি V অক্ষরের মতো দেখায়। *Solanum nigrum* এর সবকটি ক্রোমোজোমই মধ্যকেন্দ্রিক। মধ্যকেন্দ্রিক আদি বৈশিষ্ট্য।

(খ) উপ-মধ্যকেন্দ্রিক (Submetacentric) : যে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি মধ্যস্থান থেকে একটু এক পাশে অবস্থিত তাকে উপ-মধ্যকেন্দ্রিক বা সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এ ধরনের ক্রোমোজোমের দুটি বাহু অসমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয় এবং অ্যানাফেজ পর্যায়ে ইংরেজি L অক্ষরের মতো দেখায়।

(গ) উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক (Acrocentric) : এসব ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি একবারে প্রান্তের কাছাকাছি থাকে। এসমস্ত ক্রোমোজোমের এক বাহু অনেক লম্বা এবং অপর বাহু বেশ খাটো থাকে। অ্যানাফেজ পর্যায়ে এসমস্ত ক্রোমোজোমকে ইংরেজি J অক্ষরের মতো দেখায়।

(ঘ) প্রান্তকেন্দ্রিক (Telocentric) : যে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে প্রান্তভাগে অবস্থিত তাকে প্রান্তকেন্দ্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এদেরকে একবাহু বিশিষ্ট ক্রোমোজোম বলে মনে হয়। অ্যানাফেজ পর্যায়ে এদেরকে ইংরেজি I অক্ষরের মতো বা দন্ডের মতো দেখায়। উদ্ভিদে সাধারণত এ ধরনের ক্রোমোজোম থাকে না।

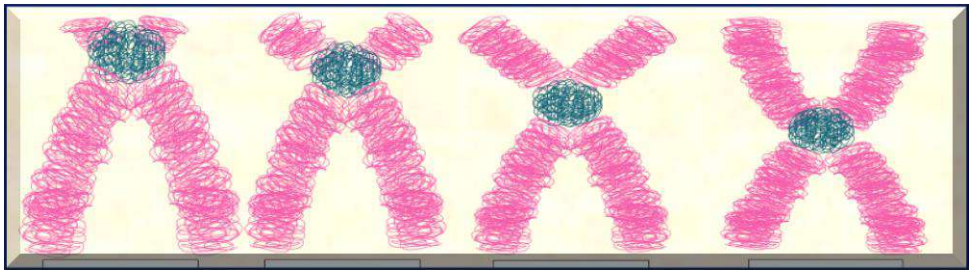

প্রান্তকেন্দ্রিক উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক উপ-মধ্যকেন্দ্রিক মধ্যকেন্দ্রিক

চিত্র : ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ

৩। দেহ গঠন ও লিঙ্গ নির্ধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ (Types of chromosomes according to body composition and sex determination characteristics) : দেহ গঠন ও লিঙ্গ নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রোমোজোম নিম্নলেখিত দুই ধরনের হয়; যথা-

(ক) অটোসোম (Autosome) : যেসব ক্রোমোজোম দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বহন করে তাদেরকে অটোসোম বলে। অটোসোমের সেটকে A চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম।

(খ) সেক্স ক্রোমোজোম (Sex chromosome) : সেক্স ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। সেক্স ক্রোমোজোম দু'প্রকার; যথা- X ও Y। মানুষের একজোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। স্ত্রীদেহে দুটি সেক্স ক্রোমোজোম এক প্রকার (XX) এবং পুরুষ দেহে সেক্স ক্রোমোজোম দুটি ভিন্ন ধরনের (XY) হয়।

DNA এর রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure of DNA) : DNA একটি বৃহৎ ও জটিল জৈব- রাসায়নিক যৌগ। এটি রাসায়নিক দিক দিয়ে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড অণুর পলিমার। একটি DNA খন্ডকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে নিম্নলেখিত তিন ধরনের উপাদানসমুহ পাওয়া যায়। যথা- ১। পেন্টোজ স্যুগার, ২। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক ও ৩। ফসফরিক এসিড ।

১। পেন্টোজ স্যুগার (Pentose sugar) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট স্যুগারকে বলা হয় পেন্টোজ স্যুগার। DNA অণুর পেন্টোজ স্যুগারটি β-D ডিঅক্সিরাইবোজ ধরনের। এদের ২নং কার্বনে একটি অক্সিজেন পরমাণু কম থাকে (deoxy = less of one oxygen) বলে এদের 2 β-D ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগার বলা হয়।

২। নাইট্রোজেন ক্ষারক (Nitrogenous base) : DNA অণুতে দুই ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক থাকে। নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে এই ক্ষারকসমুহ গঠিত। ক্ষারকগুলো এক রিং বিশিষ্ট বা দুই রিং বিশিষ্ট হতে পারে। এই রিং এর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ক্ষারক দুই প্রকার; যথা- (i). পিউরিন এবং (ii). পাইরিমিডিন।

(ক) পিউরিন (Purine) : দুই রিং বিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পিউরিন । এর সাধারণ সংকেত হলো $C_5H_4N_4$। DNA-তে দুই প্রকার পিউরিন ক্ষারক থাকে, যথা- অ্যাডিনিন (adenin) এবং গুয়ানিন (guanine)।

(খ) পাইরিমিডিন (Pyrimidine) : এক রিং বিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পাইরিমিডিন। এর সাধারণ সংকেত হলো $C_4H_4N_2$। DNA-তে দুই প্রকার পাইরিমিডিন ক্ষারক থাকে. যথা- সাইটোসিন (cytosine) এবং থায়ামিন (thymine)। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে পিউরিন বলয় এর কার্বন সংখ্যা ঘড়ির কাঁটার আবর্তনের বিপরিত দিক থেকে এবং পাইরিমিডিন বলয় এর কার্বন সংখ্যা ঘড়ির কাঁটার আবর্তনের দিকে গননা করা হয়।

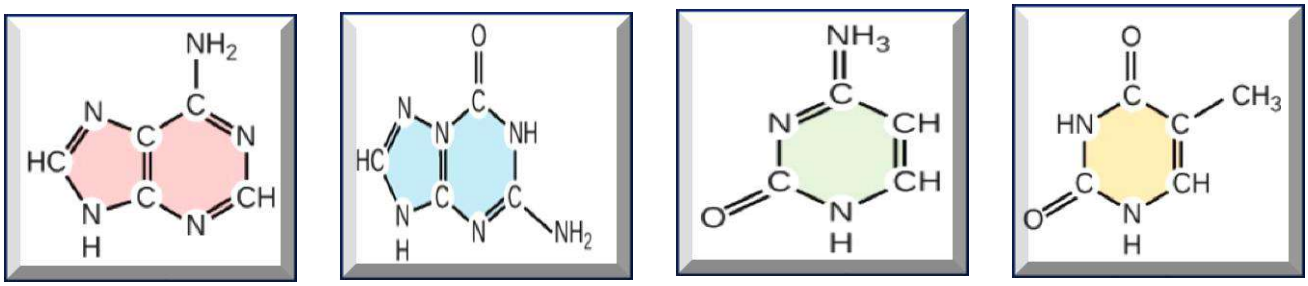

অ্যাডেনিন (A) গুয়ানিন (G) সাইটোসিন (C) থায়ামিন (T)

চিত্র : নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক

৩। ফসফরিক এসিড (Phosphoric acid) : DNA এর একটি অন্যতম উপাদান হলো ফসফোরিক এসিড। এর আণবিক সংকেত H_3PO_4। এটি অজৈব ফসফেট হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এটি একটি ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগারের ৩নং কার্বনের সাথে ও অপর একটি ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগারের ৫নং কার্বনের সাথে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

পিউরিন ও পাইরিমিডিন বেস ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগারের সঙ্গে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড সৃষ্টি করে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওসাইড অণু গঠন করে। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওসাইড ফসফোরিক এসিডের সঙ্গে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড অণু গঠন করে। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের পলিমারই হলো DNA।

DNA-র কাজ (Function of DNA) : নিম্নে DNA-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করা হলো-

১। ক্রোমোজোমের গাঠণিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২। বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৩। জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ধারন করে ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। জীবের বৈশিষ্ট্যসমুহ পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর করে।

৫। জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৬। জীবের সকল শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

৭। জীবের পরিবৃত্তির (mutation) ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৮। DNA-এর কাঠামোয় কোনো গোলোযোগ সৃষ্টি হলে, তা সে নিজেই সংশোধন করে।

৯।

১০।

১১।

RNA বা রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic Acid) : যে নিউক্লিক এসিডের পলিনিউক্লিওটাইড শিকলের মনোমার এককগুলোর স্যুগার অণুটি রাইবোজ প্রকৃতির এবং বিশেষ নাইট্রোজেন ক্ষারক হিসেবে ইউরাসিল থাকে, তাকে রাইবোনিউক্লিক এসিড বা RNA বলে। RNA একতন্ত্রী অর্থাৎ এক সূত্রক বিশিষ্ট নিউক্লিক এসিড।

অবস্থান (Location) : সকল জীবকোষে RNA থাকে। কোষের ৯০% RNA থাকে সাইটোপ্লাজমে এবং ১০% RNA থাকে নিউক্লিয়াসে। সাইটোপ্লাজম, রাইবোজোম, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিডেও RNA পাওয়া যায়। অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে প্রধান জেনেটিক পদার্থরূপে RNA উপস্থিত থাকে। কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া প্রাণি ভাইরাসে RNA অনুপস্থিত থাকে।

ভৌত গঠন (Physical structure) : RNA একসূত্রক, চেইনের মতো; কখনই দ্বিসূত্রক ও সর্পিলাকার (double helical) হয় না। তবে এটি অনেক সময় স্থানে স্থানে কুন্ডলীকৃত হয় বা ভাঁজ সৃষ্টি করার ফলে দ্বিসূত্রকের মতো আকৃতি গঠন করে এবং এ ভাঁজগুলোকে গৌণকুন্ডলী বলা হয়। এর গঠনে একাধিক U আকৃতির ফাঁস থাকে। কুন্ডলীগুলোতে হাইড্রোজেন বন্ডের সাহায্যে বেসগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু কুন্ডলীবিহীন অংশে বেসগুলো বন্ধনহীন। পি. জে. গোমেটস এবং আই ট্যাম (P. J. Gomatos and I. Tamm) 'রিও ভাইরাসে' দ্বিসূত্রক RNA অণুর অস্তিত্ব পান। ধানের বামন রোগের ভাইরাসেও দ্বিসূত্রক RNA বিদ্যমান।

রাসায়নিক গঠন (Chemical structure) : রাসায়নিক দিক দিয়ে RNA অণু রাইবোনিউক্লিওটাইড অণুর পলিমার। RNA অণুতে প্রধানত ৩ ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে, যেমন-

১। পেন্টোজ স্যুগার : রাইবোজ।

২। নাইট্রোজেন বেস : এটি দু'ধরনের, যথা-

(ক) পিউরিন : RNA অণুতে অ্যাডিনিন (adenine) ও গুয়ানিন (guanine) নামক দুই প্রকার পিউরিন থাকে।

(খ) পাইরিমিডিন : RNA অণুতে সাইটোসিন (cytosine) ও ইউরাসিল (uracil) নামক দুই প্রকার পাইরিমিডিন থাকে।

৩। ফসফোরিক এসিড : এটি অজৈব ফসফেট হিসেবে বিদ্যমান থাকে। পিউরিন ও পাইরিমিডিন বেস রাইবোজ স্যুগারের সঙ্গে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড সৃষ্টি করে রাইবোনিউক্লিওসাইড অণু গঠন করে। রাইবোনিউক্লিওসাইড ফসফোরিক এসিডের সঙ্গে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে রাইবোনিউক্লিওটাইড গঠন করে। রাইবোনিউক্লিওটাইডের পলিমারই হলো RNA। একটি ক্ষুদ্রতর RNA-তে ২২টি এবং একটি বৃহৎ RNA-তে ১০,০০০টি রাইবোনিউক্লিওটাইড থাকতে পারে।

RNA-এর কাজ (Functions of RNA) :

১। RNA-এর প্রধান কাজ হলো প্রোটিন সংশ্লেষণ করা।

২। কিছু RNA বিভিন্ন এনজাইমের কাঠামো গঠন করে।

৩। ভাইরাসের RNA বংশগতিতে ভূমিকা রাখে।

৪। রাইবোজোমের অন্যতম মূল গাঠনিক উপাদান হিসেবে RNA থাকে।

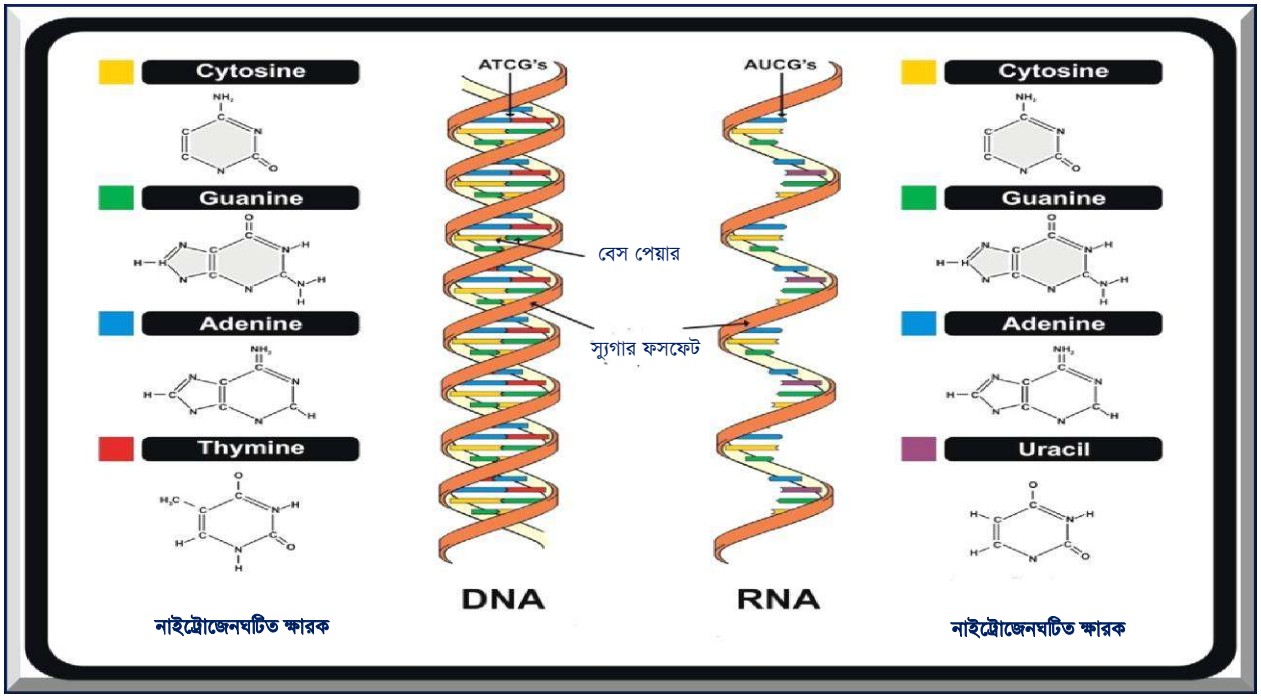

চিত্র : DNA ও RNA-এর তুলনামূলক অবস্থান

RNA-এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of RNA) : কার্যানুসারে RNA প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- ১। জেনেটিক RNA ও ২। নন-জেনেটিক RNA।

১। জেনেটিক RNA (Genetic RNA) : যেসব RNA প্রতিলিপিকরণে সক্ষম এবং জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ ও বংশানুক্রমে পরিবহন করে, তাকে জেনেটিক RNA বলে। যেসব দেহে gRNA থাকে, তাদের DNA থাকে না (যেমন- TMV. HIV)। যেমন- সমগ্র ভাইরাল RNA। কোনো জীবকোষেই gRNA থাকে না।

২। নন-জেনেটিক RNA (Non-genetic RNA) : যেসব RNA প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে কিন্তু সরাসরি বংশগতির কাজে অংশগ্রহণ করে না, তাদের নন-জেনেটিক RNA বলে। যেমন- সকল আদিকোষ ও প্রকৃতকোষের RNA। নন-জেনেটিক RNA আবার চার প্রকার। যথা-

(ক) বার্তাবহ RNA (Messenger RNA) : যে RNA নিউক্লিয়াসের ভেতরে DNA সিকুয়েন্স অনুযায়ী সৃষ্টি হয়ে জেনেটিক বার্তাকে সাইটোপ্লাজমে বহন করে এবং রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে, তাকে বার্তাবহ RNA বা মেসেঞ্জার RNA বা mRNA বলে। DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA ।সৃষ্টি হয়। mRNA লম্বা চেইনের মতো। mRNA-এর ৫′প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডনবিহীন, এ প্রান্তকে ৫′-লিডার (5′-leader) বলে। আবার ৩′প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডনবিহীন, এ প্রান্তকে ৩′-ট্রেইলার (3′-trailer) বলা হয়। মাঝখানের অংশকে কোডিং অংশ (coding region) বলে। পরপর তিনটি বেস মিলে একটি কোডন হয়। কোষের ৩ - ৫% RNA হলো mRNA। জ্যাকোব ও মোনাড (Jacob and Monod) এদের নামকরণ করেন।

কাজ : এরা নিউক্লিয়াস হতে জেনেটিক বার্তা বহন করে রাইবোজোমে নিয়ে যায় এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের ছাঁচ হিসেবে কাজ করে।

(খ) পরিবাহক RNA (tRNA) : যেসব RNA জেনেটিক কোড অনুযায়ী একেকটি অ্যামিনো এসিডকে mRNA অণুতে স্থানান্তর বা পরিবহন করে প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে সেগুলোকে পরিবাহক RNA বা ট্রান্সফার RNA বলে। এটি একটি ক্ষুদ্র প্রকৃতির RNA। কোষের প্রায় ১৫% RNA-ই tRNA। এতে ৭৫ - ৯০টি নিউক্লিওটাইড অণু থাকে। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি tRNA একসূত্রক এবং লম্বা চেইনের মতো থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটি ভাঁজ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বেস-এর মধ্যে জোড়ার সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি tRNA-তে একাধিক ফাঁস (loop) সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁস হলো অ্যান্টিকোডন ফাঁস যা mRNA-এর কোডন-এর সাথে মুখেমুখে বসে যেতে পারে। tRNA-৩′প্রান্ত এক সূত্রেক এবং সব সময়ই CCA ধারায় বেস সজ্জিত থাকে। এখানে অ্যামিনো এসিড সংযুক্ত হয়। একে বলা হয় অ্যামিনো এসিড সাইট। ফাঁস অবস্থায় সব সময়ই অ্যান্টিকোডন ফাঁস ও অ্যামিনো এসিড সাইট বিপরিত অবস্থানে থাকে। তিনটি বেস নিয়ে অ্যান্টিকোডন সৃষ্টি হয়।

আমেরিকান বিজ্ঞানী হোলি (R. Holley) ও নিরেনবার্গ (Nirenberg) এবং ভারতীয় বিজ্ঞানী খোরানা (Khorana) ১৯৬৫ সালে tRNA গঠনের লবঙ্গ পত্র বা ক্লোভার লিফ (clover-leaf) মডেল প্রণয়ন করেন। এজন্য তাঁরা ১৯৬৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কাজ : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় জেনেটিক কোড অনুসারে নির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিডকে mRNA-তে স্থানান্তর করাই tRNA-এর কাজ।

(গ) রাইবোজোমাল RNA (rRNA) : যে RNA রাইবোজোমের প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে রাইবোজোম গঠন করে অর্থাৎ রাইবোজোমের প্রধান গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে রাইবোজোমাল RNA বা rRNA বলে। কোষের সমস্ত RNA-এর ৮০ - ৯০%-ই rRNA। এরা নিউক্লিয়াসে সৃষ্টি হয়ে রাইবোজোমে অবস্থান করে। এর আণবিক ওজন ৬ - ১১ লাখ ডাল্টন। এরা সবচেয়ে বেশি স্থায়ী এবং অদ্রবণীয়। rRNA নিম্ন আয়নিক মাত্রায় কুন্ডলিত অবস্থায় থাকে, তবে আয়নিক মাত্রা বেড়ে গেলে এদের বেসগুলো জোড় বেঁধে বিভিন্ন স্থানে দ্বিসূত্রক অবস্থা সৃষ্টি করে। দ্বিসূত্রক অবস্থানে অ্যাডিনিন ও ইউরাসিল এবং গুয়ানিন ও সাইটোসিন জোড় বাঁধে। প্রোক্যারিওটিক কোষে (ব্যাকটেরিয়া) তিন ধরনের (যথা- 23S, 16S ও 5S) এবং ইউক্যারিওটিক কোষে চার ধরনের (যথা- 28S, 18S, 5.8S ও 5S) rRNA পাওয়া যায়।

কাজ : mRNA-এর বাহিত সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণ করা rRNA-এর প্রধান কাজ। এছাড়া এরা রাইবোজোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

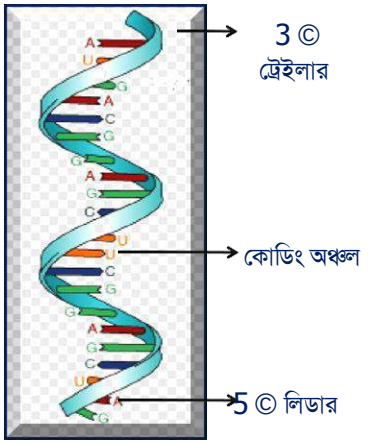

চিত্র : একটি mRNA

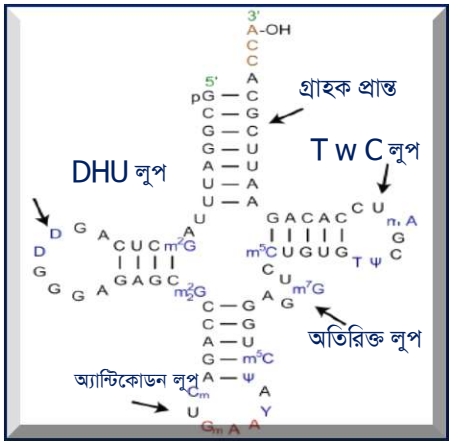

চিত্র : tRNA-এর ক্লোভার লিফ মডেল

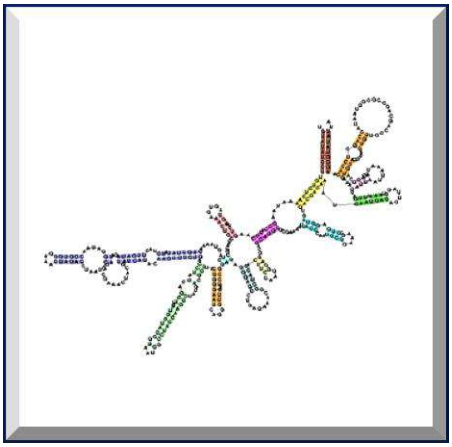
চিত্র : rRNA-এর আণবিক গঠন

DNA ও RNA-এর মধ্যে পার্থক্য (Differences between DNA and RNA) :

পার্থক্যের বিষয়	ডিএনএ (DNA)	আরএনএ (RNA)
১। অবস্থান	প্রধানত ক্রোমোজোমে থাকে। তবে কখনো মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ও সাইটোপ্লাজমে থাকে।	সাধারণত ক্রোমোজোম, রাইবোজোম, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্রাজমে থাকে।
২। ভৌত গঠন	দ্বিসূত্রক, প্যাঁচানো সিড়ির মতো।	একসূত্রক, শিকলের ন্যায়।
৩। পেন্টোজ স্যুগার	ডিঅক্সিরাইবোজ।	রাইবোজ।
৪। প্রকারভেদ	কার্যগত দিক হতে DNA একই রকম।	কার্যগত দিক হতে RNA পাঁচ প্রকার, যথা- mRNA, tRNA, rRNA, gRNA ও মাইনর RNA।
৫। উৎপত্তি	DNA হতে অনুলিপনের মাধ্যমে নতুন DNA সৃষ্টি হয়।	ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় DNA হতে RNA সৃষ্টি হয়।
৬। নাইট্রোজেন বেস	অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থায়ামিন দ্বারা গঠিত ।	অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল দ্বারা গঠিত।
৭। স্থায়িত্ব	চিরস্থায়ী।	কার্যগতভাবে ক্ষণস্থায়ী।
৮। প্রকৃতি	জেনেটিক বস্তু হিসেবে কাজ করে।	জেনেটিক বস্তু নয় (ভাইরাস ব্যাতীত)।
৯। রেপ্লিকেশন	রেপ্লিকেশন করতে সক্ষম।	রেপ্লিকেশনে সক্ষম নয়।
১০। আণবিক ওজন	এদের আণবিক ওজন দশ লাখ থেকে বহু কোটি ডাল্টন পর্যন্ত হয়।	এদের আণবিক ওজন কয়েক লাখ ডালটনের বেশি হয় না।
১১। প্রধান কাজ	বংশগতির ধারক ও বাহক এবং বিপাকীয় কাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।	প্রোটিন সংশ্লেষ করা। তবে কতিপয় ভাইরাসের ক্ষেত্রে বংশগতির কাজ করে।

mRNA, tRNA ও rRNA-এর মধ্যে পার্থক্য (Differences between mRNA, tRNA and rRNA) :

পার্থক্যের বিষয়	mRNA	tRNA	rRNA
১। গঠন	একতন্ত্রী (সূত্রাকার), সামান্য ভাঁজযুক্ত হলেও দ্বিতন্ত্রী গঠন করে না। এর ৫´ও ৩´প্রান্ত দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে।	প্রাথমিকভাবে একতন্ত্রী, তবে অধিকাংশ স্থানেই ভাঁজযুক্ত হয় এবং পরিপূরক বেসগুলো যুক্ত হয়ে কোনো কোনো অংশ গৌণভাবে দ্বিতন্ত্রী হয়। এদের ৫´ও ৩´প্রান্ত কাছাকাছি অবস্থান করে।	কোনো কোনো অঞ্চল ভাঁজযুক্ত হয়ে দ্বিতন্ত্রী গঠন করে।
২। অবস্থান	এরা নিউক্লিয়াসে সৃষ্টি হয়ে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।	এরা নিউক্লিয়াসে সৃষ্টি হয়ে সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।	এরা নিউক্লিয়াসে সৃষ্টি হয়ে সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোমের অংশ হিসেবে থাকে।
৩। শতকরা হার	৫%	১৫%	৮০%
৪। আকার	আকারে অপেক্ষাকৃত বড়।	আকারে বেশ ছোট।	আকারে ছোট ও বড় দুই ধরনের হতে পারে।
৫। কোডন	এর কোডিং অঞ্চলে কোডন থাকে।	এতে কোনো কোডন থাকে না।	এতে কোনো কোডন থাকে না।
৬। কাজ	ট্রান্সলেশন পদ্ধতিতে এর থেকে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল বা প্রোটিন তৈরি হয়।	ট্রান্সলেশনের কাজে mRNA-এর কোডন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো এসিড বহন করে রাইবোজোমে নিয়ে আসে।	কোষে রাইবোজোম গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং mRNA ও tRNA–এর সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে।

জিন (Gene) : জীবকোষে বিদ্যমান বংশগতির গাঠনিক ও কার্যিক নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্রতম একককে জিন বলে। জিন হলো বংশগতির উপাদান যা জীবের জৈবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে জিন হলো ক্রোমোজোমে বিদ্যমান DNA অণুর এমন একটি অংশ যা কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে সক্ষম। গ্রিক *genos* হতে gene শব্দের উৎপত্তি যার আভিধানিক অর্থ হলো জন্ম নেয়া। বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel, 1822 - 1884) মটরশুঁটি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করার সময় এদেরকে ফ্যাক্টর (factors) নামকরণ করেছিলেন। ডেনিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী উইলহেম জোহানসেন (Wilhelm Johannsen) ১৯০৯ সালে সর্বপ্রথম gene শব্দটি ব্যবহার করেন। আমেরিকান জিনতত্ত্ববিদ থমাস হান্ট মরগান (Thomas Hunt Morgan) ১৯১২ সালে প্রমাণ করেন যে, জিন কোষের ক্রোমোজোমে অবস্থিত। ভারতীয় বিজ্ঞানী হর গোবিন্দ খোরানা (Har Gobinda Khorana) কৃত্রিম জিন সংশ্লেষণ করে ১৯৬৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সুতরাং জিন হলো-

ক্রোমোজোমের DNA অণুতে অবস্থিত আত্মপ্রজননশীল, পরিব্যক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন ও জীবের পরিস্ফুটন নিয়ন্ত্রণকারী কিছু নিউক্লিয়টাইড নিয়ে গঠিত যে ক্ষুদ্রতম একক কার্যকরী পলিপেপটাইড গঠনের মাধ্যমে জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে, তাকে জিন বলে।

জিনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of gene) :

১। জিন নিউক্লিক এসিড দ্বারা গঠিত। ২। জিন ইউক্যারিওটিক কোষের ক্রোমোজোমে অবস্থান করে এবং প্রোক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিও বস্তু অথবা প্লাজমিডে অবস্থান করে। ৩। জিন বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক। ৪। জিন জীবের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে বহন করে। ৫। এটি জীবের প্রকরণ এবং পরিব্যাক্তি বা মিউটেশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ৬। জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন কাজ করে। আবার একটি জিন একাধিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কাজ করে। ৭। আকৃতি ও সংযুক্তি অপরিবর্তিত রেখে জিনের স্ব-প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা আছে। ৮। ক্রোমোজোমে প্রত্যেক জিনের স্থান নির্দিষ্ট থাকে। ক্রোমোজোমের ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিকে ঐ বিশেষ জিনের লোকাস (locus) বলা হয়।

জিনের প্রকৃতি (Nature of gene) : জীবদেহের যে কোনো বৈশিষ্ট্য জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ডিপ্লয়েড কোষের সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একটি লোকাসে সমপ্রকৃতির দুটি জিন অবস্থান করে। জিন প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। একটি জিন দ্বারা যেমন একাধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তেমনি একাধিক জিন দ্বারা একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। গঠনগত বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন জিন বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নিয়ামক দ্বারা জিনের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। জিনের বড় ধরনের পরিবর্তন জীবের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়। ইউক্যারিওটিক জীবের জিনে কোডিং ও নন-কোডিং অংশ থাকে। এদেরকে যথাক্রমে অ্যাক্সন (exon) ও ইনট্রন (intron) বলে। কেবল অ্যাক্সন অংশটি প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। জিনের সংখ্যা প্রজাতিভেদে কয়েক হাজার থেকে কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে। হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের তথ্য অনুযায়ী (২০০৭) একটি ডিপ্লয়েড মানব কোষে কার্যকরী জিনের সংখ্যা ৩০ - ৪০ হাজার।

জিনের গঠন (Structure of gene) : একটি DNA অণুর যতটুকু অংশ একটি পলিপেপটাইড গঠনের জন্য দায়ী ঠিক ততটুকু অংশকেই সাধারণভাবে জিন বলা হয়। জিনের গঠন বলতে DNA অণুর সেই নির্দিষ্ট অংশটুকুর নিউক্লিওটাইড সজ্জাবিন্যাসকে (nucleotide sequence) বোঝানো হয়। DNA অণুর A - B দৈর্ঘ্য পর্যন্ত যে নিউক্লিওটাইডগুলো আছে তারা প্রোটিন বা পলিপেপটাইড সংশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তাই A - B দৈর্ঘ্যে উপস্থিত নিউক্লিওটাইডগুলোকে একত্রে একটি জিন বলা হয়।

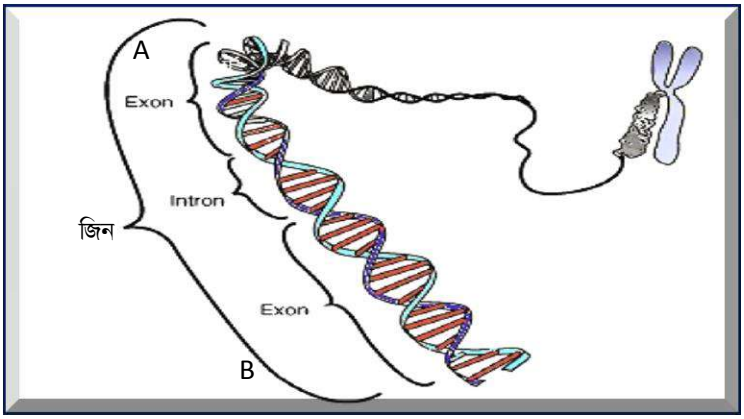

চিত্র : DNA অণুর A → B অংশে জিনের অবস্থান

জিন সম্পর্কে আধুনিক ধারনা (Modern concept of gene) : জিনকে বিভিন্ন এককরূপে প্রকাশ করা হয়। জিন সম্পর্কে কয়েকটি আধুনিক ধারনা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। রেকন (Recon) : এটি জিন রিকম্বিনেশন-এর একক। DNA অণুর যে ক্ষুদ্রতম একক জেনেটিক রিকম্বিনেশনে অংশ গ্রহণ করে তাকে রেকন বলে। রেকন এক অথবা দুই জোড়া নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত।

২। মিউটন (Muton) : একে জিন মিউটেশনের একক বলা হয়। DNA অণুর যে ক্ষুদ্রতম অংশে মিউটেশন সংঘটিত হয়, তাকে মিউটন বলে। এক বা একাধিক নিউক্লিওটাইড যুগল নিয়ে মিউটন গঠিত হয়ে থাকে।

৩। রেপ্লিকন (Replicon) : DNA-এর যে অংশ DNA-এর অনুলিপন নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলে রেপ্লিকন।

৪। সিসট্রন (Cistron) : DNA অণুর যে খন্ডাংশ কোষীয় বস্তুর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলে সিসট্রন। *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার একটি সিসট্রনে প্রায় ১৫০০টি নিউক্লিওটাইড যুগল থাকে। প্রতিটি সিসট্রনে অনেক রেকন ও মিউটন থাকে। তাই রেকন ও মিউটন অপেক্ষা সিসট্রনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিন ও সিসট্রন প্রায় সমতুল্য (equivalent) অর্থ বহন করে।

বিভিন্ন ধরনের জিন (Different kinds of gene) :

১। লিথাল জিন (Lethal gene) : যে জিনের বহি :প্রকাশের কারণে জীবের মৃত্যু ঘটে তাকে লিথ্যাল জিন বলে।

২। অঙ্কোজিন (Oncogene) : যে জিনের কারণে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হয় তাকে অঙ্কোজিন বলে।

৩। খন্ডিত জিন (Split gene) : যে জিন অ্যাক্সন ও ইনট্রন সহযোগে গঠিত হয় তাকে খন্ডিত জিন বা স্প্লিট জিন বলে।

৪। অটোজোমাল জিন (Autosomal gene) : যেসব জিন অটোজোমে অবস্থান করে তাদের অটোজোমাল জিন বলে।

৫। সেক্স-ক্রোমোজোমাল জিন (Sex-cromosomal gene) : যেসব জিন X ক্রোমোজোম বহন করে তাদের সেক্স ক্রোমোজোমাল জিন বলে। যেমন- বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি রোগ প্রকাশক জিন

৬। হোলান্ড্রিক জিন (Holandric gene) : Y ক্রোমোজোম যে সব জিন বহন করে সেগুলিকে হোলান্ড্রিক জিন বলে। যেমন- মানুষের কানের লোম প্রকাশক জিন।

৭। সিউডো জিন (Pseudo gene) : DNA এর যে অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে বা জিনের যে অংশ থেকে কোনো পলিপেপটাইড তৈরি হয় না তাকে সিউডো জিন বলে।

৮। ট্রান্স জিন (trans gene) : যে জিন উদ্ভিদকোষ বা প্রাণিকোষ থেকে নিয়ে অন্য কোনো প্রজাতির উদ্ভিদকোষ বা প্রাণিকোষে প্রতিস্থাপন করা হয় তাকে ট্রান্স জিন বলে।

আদিকোষে জিন প্রকাশ : জিন ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যার জন্য Jacob & Monad ১৯৬১ সালে 'অপেরন মডেল' প্রস্তাব করেন। তাঁদের মতে, কতকগুলো জিনের সমন্বয়ে একটি অপেরন (operon) গঠিত হয় এবং আদিকোষে এদের পারস্পরিক ক্রিয়ায় কার্যকরী জিনের প্রকাশ ঘটে। প্রতিটি আদিকোষী জীবে এক বা একাধিক অপেরন থাকে, যেমন- ল্যাক্টোজ অপেরন (ল্যাক্টোজের উপস্থিতিতে ক্রিয়াশীল)। চারটি অংশ নিয়ে অপেরন গঠিত হয়। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

১। গাঠনিক জিন (Structural gene) : যে জিন এনজাইম সংশ্লেষ করে।

২। উদ্দীপক জিন (Promoter gene) : যেখানে RNA পলিমারেজ এনজাইম সংযুক্ত হয়।

৩। চালক জিন (Operator gene) : চালক জিন গাঠনিক জিনের প্রোটিন উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। নিয়ন্ত্রক জিন (Regulator gene) : যা অপারেটর জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রকৃত কোষে জিন প্রকাশ (Gene expression in actual cells) : জীবদেহের সকল তথ্য জিন তথা DNA-তে সংরক্ষিত থাকে। প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে এসব তথ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় জিন প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে তাকে জিনের ক্রিয়া (action of gene) বলে। প্রকৃতকোষে জিনের প্রকাশ ঘটে যথাক্রমে- (i). ট্রান্সক্রিপশন, (ii). mRNA প্রসেসিং, (iii). ট্রান্সলেশন, (iv). ট্রান্সলেশন পরবর্তী প্রসেসিং এবং (v). ফিড ব্যাক (feed back) ইনহিবিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমের 'অপেরন' এর জিন ক্রিয়া-কৌশল হতে সুকেন্দ্রিক কোষের ক্রোমোজোমস্থ জিনের ক্রিয়া-কৌশল অপেক্ষাকৃত জটিল। ক্রোমোজোমের ইউক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয় কিন্তু হেটারোক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয় না।

জিনের কাজ (Function of gene) :

১। জিন জীবদেহে যাবতীয় বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের (ফিনোটাইপ) প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২। জিন জীবের সাংগাঠনিক ও বিপাকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রোটিন, এনজাইম অথবা হরমোন সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

৩। জীবদেহের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলো বংশগতির একক হিসেবে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

৪। জিন নির্দিষ্ট প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণকে নিশ্চিত করে।

৫। জিন জীবদেহে mRNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের হারকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। জিন মিউটেশনের একক হিসেবে কাজ করে যা বিবর্তন ও অভিযোজনে ভূমিকা রাখে।

আদিকোষ ও প্রকৃতকোষের জিনগত পার্থক্য (Genetic differences between prokaryotic cell and eukaryotic cells) :

১। আদিকোষে একাধিক জিন কাছাকাছি থেকে অপেরন গঠন করে। কিন্তু প্রকৃতকোষে জিনসমূহ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করে, এরা অপেরন গঠন করে না।

২। আদিকোষে অপেরনের মাধ্যমে নিকট সম্পর্কযুক্ত একাধিক জিন ট্রান্সক্রাইব হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতকোষে পৃথকভাবে ট্রান্সক্রাইব হয়ে থাকে।

৩। আদিকোষে প্রতিটি জিনে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই (হরমোন রেসপন্স এলিমেন্ট নেই) কিন্তু প্রকৃতকোষের প্রতিটি জিনে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে, এদের প্রোমোটারের কাছে 'হরমোন রেসপন্স এলিমেন্ট' থাকে।

৪। আদিকোষে বিভিন্ন জিনকে ট্রান্সক্রাইব করতে এক ধরনের RNA-পলিমারেজ অংশ নেয়, কিন্তু প্রকৃতকোষে বিশেষ বিশেষ জিন ট্রান্সক্রাইব করতে বিভিন্ন ধরনের RNA-পলিমারেজ অংশ নেয়।

৫। আদিকোষে পলিমারেজ দ্বারা প্রোমোটার পুনঃক্রিয়াশীল করতে একটি পেপটাইড সাবইউনিট সম্পৃক্ত হয় কিন্তু প্রকৃতকোষে ট্রান্সক্রিপশনের সূচনা পর্বে বহু প্রোটিন সম্পৃক্ত হয়।

জেনেটিক কোড (Genetic Code) : DNA-এর সিকুয়েন্স অনুযায়ী সৃষ্ট mRNA অণুর উপর সজ্জিত পরপর তিনটি নিউক্লিওটাইড মিলে অ্যামিনো এসিডের জন্য যে অর্থবহ সংকেত তৈরি হয় তাকে জেনেটিক কোডন বা জেনেটিক কোড বলে। সহজ কথায় জেনেটিক কোড হলো জিনের একটি সাংকেতিক সজ্জারূপ যা প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় অ্যামিনো এসিডের অনুরূপ একটি সজ্জাকে নির্দিষ্ট করে। এটি জীবের জৈব রাসায়নিক ভিত্তি এবং প্রায় সকল জীবে একইভাবে থাকে।

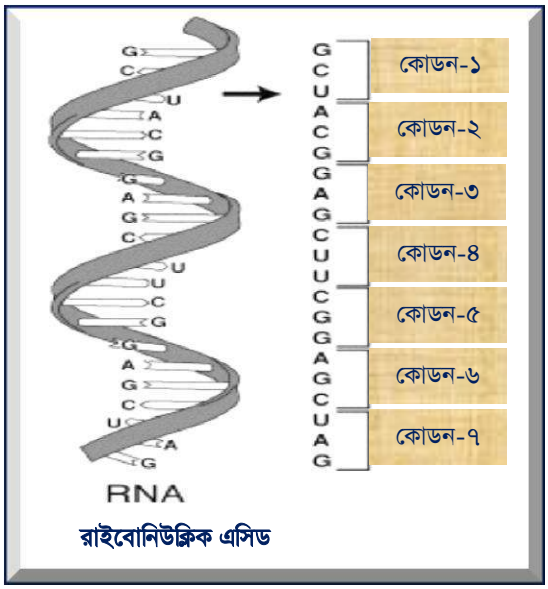

চিত্র : mRNA অণুর অংশে কোডনগুলির একটি সিরিজ

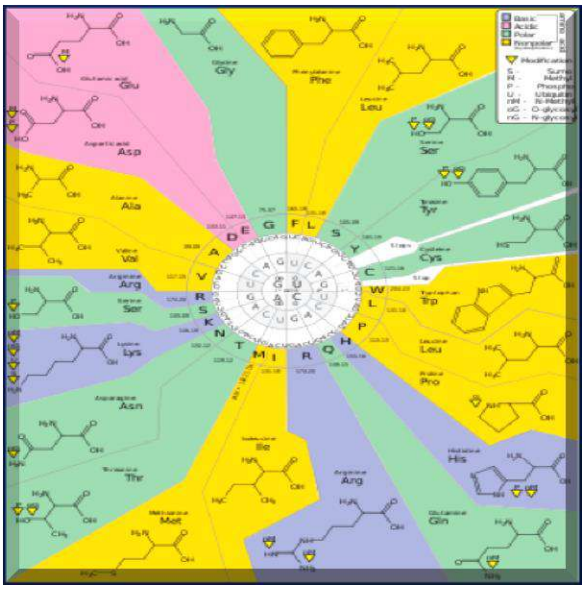

চিত্র : জেনেটিক কোড

জেনেটিক কোডনের প্রকার (Type of genetic code) : নিউক্লিওটাইডের ৬৪টি ত্রয়ী কোড নিয়ে জেনেটিক কোড গঠিত। এসব ত্রয়ী কোডসমূহকে কোডন (codon) বলা হয়। প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় তিনটি ব্যাতিক্রম ছাড়া প্রতিটি কোডন ২০ ধরনের অ্যামিনো এসিডের জন্য সংকেত প্রদান করে। কোডন তিন ধরনের হয়, যথা-

১। বোধন কোডন (Sense codon) : যেসব কোডন অ্যামিনো এসিড সৃষ্টির জন্য সংকেত প্রদান করে তাদের বোধন কোডন বা সেন্স কোডন বলে। জেনেটিক কোডের মধ্যে ২০ ধরনের অ্যামিনো এসিডের জন্য ৬১টি বোধন কোডন বিদ্যমান।

২। আরাম্ভ কোডন (Start codon) : যে কোডন দ্বারা প্রোটিন সংশ্লেষণের ট্রান্সলেশন দশা বা পলিপেপটাইড শিকল সৃষ্টি শুরু হয় তাকে আরাম্ভ কোডন বা ইনিশিয়াল কোডন বলা হয়। AUG কোডন হলো আরাম্ভ কোডন। প্রকৃতকোষে এটি প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রারম্ভিক অ্যামিনো এসিড মিথিওনিন (methionine) এবং আদিকোষে এন-ফরমাইল মিথিওনিন (N-formyl methionine) সৃষ্টির সংকেত প্রদান করে।

৩। বিরাম কোডন (Stop codon) : যেসব কোডন দ্বারা প্রোটিন সংশ্লেষণের ট্রান্সলেশন দশার বা পলিপেপটাইড শিকল সৃষ্টির সমাপ্তি ঘটে তাদের বিরাম কোডন বা টার্মিনাল কোডন বলে। UAA, UAG, UGA কোডন হলো বিরাম কোডন। এরা অ্যামিনো এসিড সৃষ্টির জন্য কোনো সংকেত প্রদান করে না বলে এদের অবোধন বা নন সেন্স কোডন বলে।

জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of genetic code) :

১। জেনেটিক কোড একটি ট্রিপলেট কোড, যেখানে তিনটি সন্নিহিত ক্ষারক একত্রে একটি mRNA কোডন গঠন করে যা একটি অ্যামিনো এসিডের জন্য সংকেত প্রদান করে।

২। একটি কোডন কখনও একাধিক অ্যামিনো এসিডকে কোড করে না।

৩। জেনেটিক কোড সর্বদা অনতিক্রম্য (non-overlapping) অর্থাৎ সন্নিহিত কোডন এক অপরকে অতিক্রম করে না।

৪। জেনেটিক কোড বিরাম চিহ্নহীন অর্থাৎ এগুলোতে কোনো কমা (,) থাকে না।

৫। জেনেটিক কোড সার্বজনীন অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কোড সকল জীবে একই ধরনের অ্যামিনো এসিডকে সুনির্দিষ্ট (specify) করে।

৬। ৬৪টি জেনেটিক কোডের মধ্যে তিনটি (যথা- UAA, UAG ও UGA) কোনো অ্যামিনো এসিডকে সুনির্দিষ্ট করে না কিন্তু সংকেত প্রদানের সমাপ্তি (stop) হিসেবে কাজ করে।

৭। কোডন AUG কে সূচনা বা স্টার্ট কোডন বলা হয় কেননা এটি পলিপেপটাইড শিকল সংশ্লেষণের সূচনা ঘটায়।

৮। জেনেটিক কোডের ৫′ ⟶ ৩′ অভিমুখে মেরু (polarity) নির্দেশিত হয়।

ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) : যে প্রক্রিয়ায় জীব কোষে, DNA অণুর একটি সূত্রকের পরিপূরক ক্ষারক সমন্বিত mRNA সূত্রক সৃষ্টি হয়, সেই প্রক্রিয়াকে ট্রান্সক্রিপশন বলে। DNA অণুর যতটুকু অংশ অবিরতভাবে একটি RNA অণুর সৃষ্টি করে তাকে ট্রান্সক্রিপশন একক বলা হয়। একটি ট্রান্সক্রিপশন এককে তিনটি অংশ থাকে, যথা- প্রোমোটার স্থান (বিশেষ বেস সিকুয়েন্স), ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইট (শুরুর বিন্দু) এবং সমাপ্তি স্থান (শেষ বিন্দু)।

ট্রান্সক্রিপশনের সংঘটনস্থল (Place of transcription) : আদিকোষে ট্রান্সক্রিপশন ঘটে সাইটোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকা নিউক্লিওয়েড DNA-তে। প্রকৃতকোষে নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ ক্রোমোজোমের DNA-তে এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার ধাত্র ও ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে বর্তমান চক্রাকার DNA-তে ট্রান্সক্রিপশন ঘটে।

সংঘটনের সময়কাল : সজীবকোষে সবসময় ট্রান্সক্রিপশন ঘটে (অর্থাৎ ইন্টারফেজ ও কোষ বিভাজনের সব দশাতেই ট্রান্সক্রিপশন ঘটে)। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ গঠনকালে ট্রান্সক্রিপশন ঘটে।

ট্রান্সক্রিপশনের প্রয়োজনীয় উপাদান (Required elements of transcription) : ১। DNA ছাঁচ (DNA Template), ২। RNA পলিমারেজ, ৩। মুক্ত রাইবোনিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট (ATP, GTP, UTP এবং CTP), ৪। রাসায়নিক শক্তি (ট্রাইফসফেটের ভাঙ্গনে পাওয়া যায়), ৫। সহযোগী প্রোটিন (ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর) এবং ৬। কিছু ধাতব আয়ন (যেমন- Mg^{+2} ও Mn^{+2})

ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া (Transcription process) : ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি কোষের নিউক্লিয়াসে নিম্নলেখিত ধারাবাহিক ধাপের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

১। প্রারম্ভিক ধাপ (Initiation phase) : এ ধাপের শুরুতে RNA পলিমারেজ DNA অণুর প্রোমোটার (promoter) নামক স্থানে যুক্ত হয়। DNA অণুতে প্রায় ১০০টি প্রোমোটার স্থান আছে। পরবর্তীতে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর (transcription factor) নামক কিছু প্রোটিন, প্রোমোটার স্থানে RNA পলিমারেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্রান্সক্রিপশন কমপ্লেক্স গঠন করে। প্রোমোটারই RNA পলিমারেজকে নির্দেশ দেয় DNA অণুর কোন সূত্রের কোথা থেকে ট্রান্সক্রিপশন শুরু হবে এবং শেষ হবে। DNA অণুর যে নির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড থেকে mRNA সংশ্লেষণ শুরু হয় তাকে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইট transcription start sites বা সূচনা স্থান এবং যেখানে শেষ হয় তাকে এন্ড পয়েন্ট (end point) বা সমাপ্তি স্থান বলে। RNA পলিমারেজ প্রোমোটারে সংযুক্ত হয়ে প্রথমে DNA অণুর অংশ বিশেষের পাক খুলে দেয় এবং DNA সূত্র দুটির নাইট্রোজেন বেসের মধ্যকার দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙ্গে সূত্রক দুটিকে আলাদা হতে সহায়তা করে।

২। শিকল দীর্ঘকরণ ধাপ (Chain elongation phase) : RNA পলিমারেজ এনজাইম ক্রমে DNA অণুর নির্দিষ্ট দিক বরাবর ধাবিত হয়ে ডবল হেলিক্স বিচ্ছিন্ন করে এবং Mg^{++} বা Mn^{++} আয়নের সহায়তায় DNA অণুর ৩´-৫´সূত্রকের (সেন্স সূত্রক) উন্মুক্ত নাইট্রোজেন ক্ষারকের সাথে ক্রমাগত সক্রিয় পরিপূরক RNA নিউক্লিওটাইড (ATP, GTP, UTP ও CTP) যুক্ত করে mRNA শিকল দীর্ঘ করে। RNA পলিমারেজ এনজাইম DNA অণুর যে দিকে ডবল হেলিক্স বিচ্ছিন্ন করে পরিপূরক RNA নিউক্লিওটাইড যুক্ত হওয়ার পর একই এনজাইমের সাহায্যে তার বিপরিত দিকে DNA অণুর পূনর্গঠন সংঘটিত হয়। অর্থাৎ DNA অণুর ৩´-৫´ সূত্রকটি mRNA তৈরিতে ছাঁচ (template) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩। অন্তিম ধাপ (Termination phase) : ট্রান্সক্রিপশনের শেষ পর্যায়ে RNA পলিমারেজ এনজাইম DNA এর একটি বিশেষ সিকুয়েন্সের সম্মুখীন হয়। এ বিশেষ সিকুয়েন্সকে টার্মিনেটর (terminator) বলে। টার্মিনেটর সিকুয়েন্স জিনের DNA এনকোডিং (encoding) অঞ্চলের সমাপ্তি নির্দেশ করে। এভাবে সংশ্লেষিত mRNA কে pre mRNA বলে।

৪। pre mRNA প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing of pre mRNA) : প্রকৃতকোষে নতুন সংশ্লেষিত pre mRNA-কে সরাসরি ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। প্রতিটি pre mRNA কোডিং ও নন-কোডিং অংশ থাকে। এদেরকে যথাক্রমে অ্যাক্সন (axon) ও ইনট্রন (intron) বলে। কেবল অ্যাক্সন ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ইনট্রনের কাজ আজও জানা যায়নি। ব্যবহারের পূর্বে pre mRNA এর ইনট্রন অংশগুলোকে কেটে ফেলে দিয়ে কেবল অ্যাক্সন অংশগুলোকে জোড়া লাগানো হয়। এ পদ্ধতিকে স্প্লাইসিং (splicing) বলে যাতে স্প্লাইমিয়োসোম (spliceosome) নামক জটিল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া mRNA অণুর ৫´ প্রান্তে একটি গুয়ানিন ক্যাপ (guanine neucleotie) এবং ৩´ প্রান্তে পলি A লেজ (50-250 adenine) সংযুক্ত করা হয়। এভাবে সংশ্লেষিত mRNA অণুকে mature mRNA বলে। ক্যাপ ও লেজ সংযুক্তির সুবিধা হলো mature mRNA নিউক্লিয়ার ছিদ্রপথে বের হয়ে সহজে রাইবোজোমের সাথে যুক্ত হতে পারে।

সংশ্লেষিত mRNA অণু DNA অণুর যে অঞ্চল হতে সৃষ্টি হয় তার পরিপূরক ক্ষারক নিয়ে গঠিত হয়। mRNA-এর ক্ষেত্রে অ্যাডিনিনের পরিপূরক হিসেবে থায়ামিনের পরিবর্তে ইউরাসিল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ডিঅক্সিরাইবোজের পরিবর্তে রাইবোজ শর্করা ব্যবহৃত হয়। mRNA অণু DNA হতে জেনেটিক বার্তা বহন করে প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান রাইবোজোমে নিয়ে যায়। প্রতি tRNA অণু ও বার্তা ট্রান্সলেশনের মাধ্রমে প্রোটিন অণু সংশ্লেষ করে।

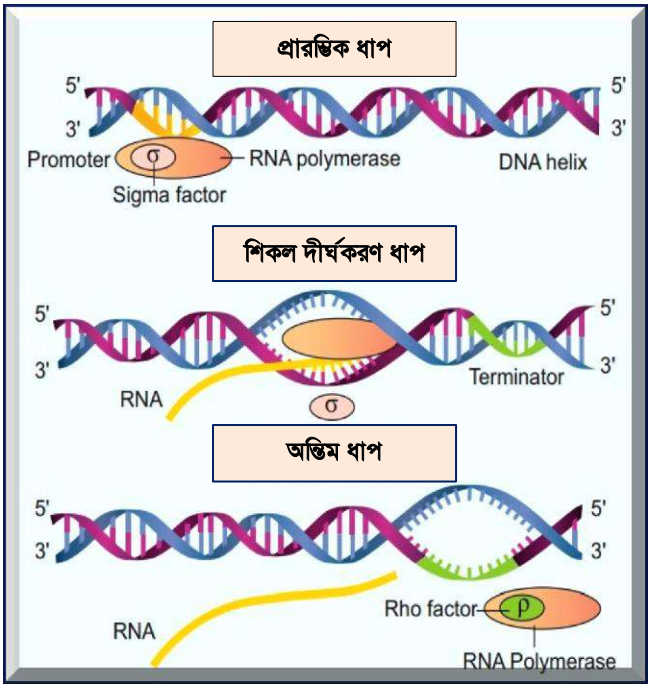

চিত্র : আদিকোষে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া

A

A

A

A

❖ **কোষ (Cell) :** জীবদেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বলে। জীবদেহের সমস্ত কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো কোষ যা একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং অন্য কোনো সজীব মাধ্যম ছাড়াই আত্মপ্রজননে সক্ষম।

❖ **কোষবিদ্যা (Cytology) :** জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ কোষের প্রকার, অঙ্গাণুর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, বিভাজন, বিকাশ, জৈবিক কার্যাবলী, বৃদ্ধি ইত্যাদি আলোচনা, পর্যলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে সাইটোলজি বা কোষবিদ্যা বলে।

❖ **আদিকোষ (Prokaryotic cell) :** যেসব কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত থাকে তাদেরকে আদিকোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোষ বলে।

❖ **প্রকৃতকোষ (Eukaryotic cell) :** যেসব কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিদ্যমান থাকে তাদেরকে প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ বলে।

❖ **দেহ কোষ (Somatic cell) :** বহুকোষী জীবদেহের যেসব কোষ শুধুমাত্র দেহ গঠনে অংশ গ্রহণ করে তাদেরকে দেহকোষ বলে।

❖ **জনন কোষ (Reproductive cells) :** বহুকোষী জীবের যেসব কোষ কেবলমাত্র জননাঙ্গ গঠন করে এবং জনন কাজে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে জননকোষ বলে। এরা দু'ধরনের হয়, যেমন- পুংগ্যামেট বা শুক্রাণু এবং স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বাণু।

❖ **কোষীয় অঙ্গাণু (Cellular organelles) :** কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত কোষের যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলি সম্পন্নকারী সজীব অঙ্গাণুগুলোকে কোষীয় অঙ্গাণু বা সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু বলে। যেমন- নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, রাইবোজোম ইত্যাদি।

❖ **কলয়েড (Colloid) :** পদার্থের একটি বিশেষ অবস্থাকে কলয়েড বলে, যা সাসপেনশন এবং দ্রবণের মাঝামাঝি।

❖ **কোষপ্রাচীর (Cell wall) :** উদ্ভিদকোষের প্লাজমামেমব্রেনের বাইরে যে সেলুলোজ নির্মিত, পুরু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক জড় প্রাচীর থাকে, তাকে কোষপ্রাচীর বলে।

❖ **কোষঝিল্লী (Cell membrane) :** প্রত্যেক সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে সুক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক ও অর্ধভেদ্য পাতলা পর্দা থাকে তাকে কোষঝিল্লী বলে।

❖ **কোষগহবর (Cell cavity) :** কোষের সাইটোপ্লাজমে দৃশ্যত আবরণী বেষ্টিত যে ফাঁকা অংশ দেখা যায় তাকে কোষগহবর বলে। অপরিণত কোষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কোষগহববর থাকে, পরিণত কোষে সবগুলো গহবর মিলে বড় আকৃতির একটি গহবর সৃষ্টি করে।

❖ **প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) :** জীবকোষের অভ্যন্তরে সজীব ঈষৎ স্বচ্ছ, দানাদার, কোলয়েডধর্মী পদার্থ, যা কোষপর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে।

❖ **প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast) :** কোষপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত কোষের সমুদয় সজীব ও নির্জীব পদার্থকে প্রোটোপ্লাস্ট বলে।

❖ **প্লাজমোডেসমাটা (Plasmodesmata) :** যে সূত্রবৎ অংশ পাশাপাশি কোষের সাথে কূপ বা সুক্ষ্ম ছিদ্র পথে সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ রক্ষা করে তাকে প্লাজমোডেসমাটা বলে।

❖ **সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) :** নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষঝিল্লী দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমীয় অংশের নামই হলো সাইটোপ্লাজম।

❖ **এক্টোপ্লাজম (Ectoplasm) :** সাইটোপ্লাজমের প্লাজমামেমব্রেন সংলগ্ন স্বচ্ছ, অদানাদার অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম ঘন অঞ্চলটিকে এক্টোপ্লাজম বলে।

❖ **এন্ডোপ্লাজম (Endoplasm) :** সাইটোপ্লাজমের ভেতরের দিকের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সংলগ্ন ঘন, দানাদার অর্থাৎ অধিকতর ঘন অঞ্চলটিকে এন্ডাপ্লাজম বলে।

❖ **রাইবোজোম (Ribosome) :** সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় বিরাজমান অথবা ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে গোলাকার বা ডিম্বাকার অঙ্গাণুর নাম রাইবোজোম। এটি কোষের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ উৎপাদন করে।

❖ **এন্ডাপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum) :** সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত জালিকার মতো নালিকাগুলোকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা অন্ত :প্লাজমীয় জালিকা বলে। এটি সাইটোপ্লাজমের কাঠামো তৈরি করে।

❖ **গলজি বস্তু (Golji body) :** কোষের নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি দলবদ্ধ অবস্থায় যে অঙ্গাণুগুলি দেখা যায় তাকে গলজি বস্তু বলে।

❖ **মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) :** সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত গোলাকার, দন্ডাকার, বৃত্তাকার বা তারকাকার বদ্ধ জেলির মতো দ্বিস্তর বিশিষ্ট শক্তি উৎপাদনকারী কোষীয় অঙ্গাণুকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে।

❖ **প্লাস্টিড (Plastid) :** উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত লাইপোপ্রোটিন নির্মিত দ্বিস্তরী পর্দাবেষ্টিত বর্ণহীন বা বর্ণযুক্ত, গোলাকার, ডিম্বাকার, সূত্রাকার ইত্যাদি আকৃতিবিশিষ্ট যেসব অঙ্গাণু উদ্ভিদের খাদ্য-সংশ্লেষণ, খাদ্য সঞ্চয় ও বর্ণ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তাদের প্লাস্টিড বলে।

❖ **লিউকোপ্লাস্ট (Leukoplast) :** বর্ণহীন প্লাস্টিডকে লিউকোপ্লাস্ট বলে। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে, বিশেষ করে ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

❖ **ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) :** উদ্ভিদকোষের সবুজ ছাড়া অন্য বর্ণের প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল রঞ্জকের জন্য এরা রঙিন হয়।

❖ **ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) :** সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিভিন্ন আকৃতির এবং সবুজ বর্ণের যে প্লাস্টিড সালোকসংশ্লেষণে মুখ্য ভুমিকা পালন করে , তাদের ক্লোরোপ্লাস্ট বলে।

❖ **পত্ররন্ধ্র (Stomata) :** ক্লোরোপ্লাস্টের অন্তঃপর্দা বেষ্টিত প্রকোষ্টে বিদ্যমান পানিগ্রাহী, কোলয়েডধর্মী ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র তরলকে পত্ররন্ধ্র বলে। এতে বিভিন্ন প্রকার এনজাইম, প্রোটিন, শ্বেতসার ইত্যাদি থাকে।

❖ **নিউক্লিয়াস (Nucleus) :** প্রকৃত কোষের প্রোটোপ্লাজমে সর্বপেক্ষা ঘন, প্রায় গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং দ্বিস্তর বিশিষ্ট আবরণী বেষ্টিত যে অঙ্গাণুটি জীবের বংশগতীয় পদার্থ ধারণ ও বহন করে এবং কোষের যাবতীয় জৈবনিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে,তাকে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াসকে কোষের মস্তিস্ক বলা হয়।

❖ **সিনোসাইট (Sinusitis) :** উদ্ভিদের বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষকে সিনোসাইট বলে।

❖ **নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm) :** নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ সমসত্ত্ব, স্বচ্ছ, অর্ধতরল ও দানাদার ধাত্র পদার্থ, যার মধ্যে নিউক্লিওলাস ও ক্রোমাটিন তন্তু অবস্থান করে তাকে নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিম্ফ বা নিউক্লিওরস বলে।

❖ **নিউক্লিওলাস (Nucleolus) :** নিউক্লিওপ্লাজমে অবস্থিত ক্ষুদ্র, গোলাকার, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ঘনবস্তুকে নিউক্লিওলাস বলে। এটি প্রধানত নিউক্লিয়াসের স্থির দশায় দেখা যায়।

❖ **ক্রোমাটিন তন্তু (Chromatin fiber) :** ইন্টারফেজ দশায় নিউক্লিপ্লাজমে অবস্থিত যে সুক্ষ্ম সূত্রাকার অংশগুলো জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকে তাদের ক্রোমাটিন তন্তু বা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বলে।

❖ **ক্রেমোজোম (Chromosome) :** প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড দিয়ে গঠিত, স্বপ্রজননশীল, সূত্রাকার যে অঙ্গাণু জীবের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যবলী বংশানুক্রমে ধারণ ও বহন করে এবং প্রজাতির পরিব্যাপ্তি, প্রকরণ ও বিবর্তনে সহায়তা করে, তাকে ক্রোমোজোম বলে।

❖ **ক্রোমাটিড (Chromatid) :** প্রতিটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্য বরাবর যে দু'টি সুক্ষ্ম সূতার মতো অংশ নিয়ে গঠিত তাদের ক্রোমাটিড বলে। কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রেমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দু'টি ক্রোমাটিড সৃষ্টি করে।

❖ **ক্রোমোনেমাটা (Chromonemata) :** ইন্টারফেজ দশায় ক্রোমোজোমের মধ্যে দুই বা ততোধিক সুক্ষ্ম তন্তু থাকে, তাদের ক্রোমোনেমাটা বলে।

❖ **ক্রোমোমিয়ার (S) :** মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজের সূচনালগ্নে ক্রোমোজোমের ক্রোমোনেমা তন্তুটি স্থানে স্থানে ঘনীভূত হয়ে যে পুঁতি বা দানার মতো অংশ গঠন করে, তাকে ক্রোমোমিয়ার বলে।

❖ **স্যাটেলাইট (Satellite) :** ক্রোমোজোমের এক বাহুর প্রান্তের দিকে গোলাকৃতির অংশকে স্যাটেলাইট বলে।

❖ **বংশগতীয় বস্তু (Hereditary objects) :** যেসব বস্তু বা উপাদানের মাধ্যমে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যবলী তাদের সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয় তাদের একত্রে বংশগতীয় বস্তু বলে।

❖ **নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid) :** নিউক্লিক এসিড হলো অসংখ্য পেন্টোজ সুগার, নাইট্রোজেন বেস এবং ফসফরিক এসিড সহযোগে গঠিত জৈব যৌগ, যা জীবের বংশগতির ধারাসহ সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

❖ **ডিএনএ (DNA) :** সজীব কোষে অবস্থিত স্ব-প্রজননশীল, পরিব্যাপ্তিক্ষম জীবের সব ধরনের কাজের নিয়ন্ত্রক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক যে নিউক্লিক এসিড তাকে ডিএনএ (DNA) বলে।

❖ **DNA রেপ্লিকেশন (DNA replication) :** যে প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু থেকে পূর্বানুরূপ দু'টি DNA অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে DNA রেপ্লিকেশন বলে।

❖ **আরএনএ (RNA) :** যে নিউক্লিক এসিডের পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের মনোমার এককগুলোর স্যুগার অণুটি রাইবোজ প্রকৃতির এবং বিশেষ নাইট্রোজেন বেস হিসেবে ইউরাসিল থাকে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে রাইবোনিউক্লিক এসিড বা আরএনএ (RNA) বলে।

❖ **মেসেঞ্জার RNA (mRNA) :** যে RNA জেনেটিক বার্তাকে সাইটোপ্লাজমে বহন করে ও রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে তাকে ম্যাসেঞ্জার RNA বা mRNA বা বার্তাবহ RNA বলে।

❖ **ট্রান্সফার RNA (tRNA) :** যে RNA জেনেটিক কোড অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিডকে mRNA অণুতে স্থানন্তর করে, তাকে ট্রান্সফার RNA বা tRNA বলে।

❖ **ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) :** DNA রেপ্লিকেশনের সময় DNA বা জিনের নিউক্লিওটাইড অনুক্রমে ধারণকৃত তথ্য mRNA-তে কপি বা নকল করার পদ্ধতিকে ট্রান্সক্রিপশন বা প্রতিলিপন বলে।

❖ **ট্রান্সলেশন (Translation) :** ট্রান্সক্রিপসনে সৃষ্ট mRNA-তে ধারণকৃত তথ্য বা সংকেত অনুযায়ী অ্যামিনো এসিডের শৃঙ্খল বা পলিপেপটাইড সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ট্রান্সলেশন বা অনুবাদন বলে।

❖ **জিন (Gene) :** ক্রোমোজোমে বিদ্যমান DNA অণুর যে অংশটি কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে তাকে জিন বলে।

❖ **জেনেটিক কোড (Genetic code) :** জেনেটিক কোড হলো DNA-এর সিকুয়েন্স অনুযায়ী সৃষ্ট mRNA-এর নিউক্লিওটাইড অণুর এমন সজ্জা বা ক্রম যা একটি কার্যকরী অ্যামিনো এসিড তৈরি করে।

❖ **জিনোম (Genome) :** কোনো প্রজাতির কোষে বিদ্যমান সকল ধরনের একসেট ক্রোমোজোমে বিদ্যমান সকল জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে।

❖ **ইনট্রন (Intron) :** জিনের যে অংশটুকু কোনো প্রকার কোড বহন করে না, তাকে ইনট্রন বলে।

❖ **এক্সন (Axon) :** জিনের যে অংশটুকু বংশগতীয় সংকেত বা কোড বহন করে, তাকে এক্সন বলে।

❖ **কোডন (Codon) :** কোডন হলো mRNA-তে অবস্থিত তিনটি নাইট্রোজেন বেসের সজ্জাক্রম, যা DNA-তে অবস্থিত নাইট্রোজেন বেসের পরিপূরক এবং এটি অ্যামিনো এসিডের সংকেত বহন করে।

❖ **সিস্ট্রন (Cistron) :** DNA-র ক্ষুদ্রতম অংশ, জিনের শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণকারী অংশকে সিস্ট্রন বলে।

❖ **সূচনা কোডন (Initiating codon) :** যে কোডন প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা করে তাকে সূচনা কোডন বলে। যেমন- AUG.

❖ **সমপনী কোডন (Samapani codon) :** যে কোডন প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় অ্যামিনো এসিডের সংকেত বহন করে না অর্থাৎ পলিপেপটাইড চেইন সংশ্লেষ বন্ধ করার নির্দেশ করে বা সংকেত প্রদান করে, তাকে সমাপনী কোডন বা ননসেন্স কোডন বলে। সমাপনী কোডন তিনটি, যথা- UAA, UAG, ও UGA.

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (Knowledge Based Questions)

১। কোষ কাকে বলে?
২। কোষবিদ্যা কাকে বলে?
৩। আদি কোষ কী?
৪। প্রকৃত কোষ কী?
৫। দেহ কোষ কাকে বলে?
৬। জনন কোষ কাকে বলে?
৭। অবস্থান ও কার্যভেদে কোষ কত প্রকার?
৮। কোষীয় অঙ্গাণু কী?
৯। কোষীয় বস্তু কী?
১০। সিউডোনিউক্লিয়াস কী?
১১। সাইটোসল কী?
১২। গলজি বস্তু কী?
১৩। সাইটোপ্লাজমিক শ্বসন বলতে কী বুঝ?
১৪। 70S রাইবোজোম বলতে কী বুঝ?
১৫। ক্যারিওলিম্ফ কী?
১৬। ক্রোমোজোম কী?
১৭। DNA কী?
১৮। RNA কী?
১৯। ইউনিট মেমব্রেন কী?
২০। জিনোম কী?
২১। কোষ মতবাদ কী?
২২। ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ কী?
২৩। জিনের বৈশিষ্ট্য কী?
২৪। সেন্ট্রোস্ফিয়ার কী?
২৫। নিউক্লিওটাইড কাকে বলে?
২৬। নিউক্লিক এসিড কী?
২৭। স্যাটেলাইট কী?
২৮। প্লাজমোলাইসিস কী?
২৯। ট্রান্সমিশন কী?
৩০। জেনেটিক কোড কী?
৩১। পলিরাইবোজোম কী?
৩২। সেন্ট্রিওল কী?
৩৩। DNA অনুলিপন কী?
৩৪। কোষপ্রাচীর কাকে বলে?
৩৫। মাইসেলি কী?
৩৬। মাইক্রোফাইব্রিল কী?
৩৭। মধ্যপর্দা কাকে বলে?
৩৮। কুপ কাকে বলে?
৩৯। প্লাজমোডেসমাটা কী?
৪০। পিট পেয়ার কাকে বলে?
৪১। প্রোটোপ্লাস্ট কী?
৪২। এক্টোপ্লাজম কী?
৪৩। টনোপ্লাজম কী?
৪৪। পিনোসাইটোসিস কী?
৪৫। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কাকে বলে?
৪৬। মাইটোকন্ড্রিয়া কাকে বলে?
৪৭। ক্রিস্টি কী?
৪৮। অক্সিজোম কী?
৪৯। প্লাস্টিড কাকে বলে?
৫০। লিউকোপ্লাস্ট কী?
৫১। স্ট্রোমা কী?
৫২। গ্রানাম চক্র কী?
৫৩। ATP সিনথেসিস কী?
৫৪। কোয়ান্টাজোম কী?
৫৫। সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্স কী?
৫৬। মাইক্রোটিউবিউল কী?
৫৭। কোষগহবর কাকে বলে?
৫৮। নিউক্লিয়াস কাকে বলে?
৫৯। নিউক্লিওলাস কী?
৬০। সিনোসাইট কোষ কী?
৬১। স্ফেরোজোম কী?
৬২। ক্রোমাটিন তন্তু কী?
৬৩। হেটারোক্রোমাটিন কী?
৬৪। ক্রোমাটিড কী?
৬৫। SAT ক্রোমোজোম কী?
৬৬। পিউরিন কী?
৬৭। পাইরিমিডিন কী?
৬৮। mRNA কাকে বলে?
৬৯। tRNA কাকে বলে?
৭০। rRNA কাকে বলে?
৭১। gRNA কাকে বলে?
৭২। DNA রেপ্লিকেশন কাকে বলে?
৭৩। ট্রান্সক্রিপশন কী?
৭৪। ট্রান্সলেশন কী?
৭৫। কোডন কী?
৭৬। এন্টিকোডন কী?
৭৭। জিন কী?
৭৮। লিংকড জিন কী?
৭৯। সিসট্রন কী?
৮০। সেন্ট্রাল ডগমা কী?
৮১। স্যাটেলাইট কী?
৮২। জেনেটিক কোডন কী?
৮৩। জেনেটিক কোডন কী?
৮৪। সেন্ট্রোস্ফিয়ার কী?
৮৫। স্যাটেলাইট কী?
৮৬। নিউক্লিওসাইড কী/
৮৭। ইউক্রোমাটিন কী?
৮৮। সমাপনী কোডন কী?
৮৯। সূচনা কোডন কী?
৯০। কোড অভিধান কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (Comprehension Based Questions)

১। কোষ মতবাদ বলতে কী বুঝ?
২। কোষকে জীবদেহের গঠন ও কাজের একক বলা হয় কেন?
৩। প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন?
৪। ঝিল্লীবদ্ধ ও ঝিল্লীবিহীন অঙ্গাণুর নাম লিখ?
৫। আত্মঘাতী অঙ্গাণু কী ব্যাখ্যা কর?
৬। কোষঝিল্লীর প্রয়োজনীয়তা লিখ?
৭। রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরী বলা হয় কেন?
৮। রাইবোজোমকে সর্বজনীন অঙ্গাণু বলা হয় কেন?
৯। কোষ প্রাচীরের কাজ কী?
১০। ফ্লুইড মোজাইক মডেল কী?
১১। প্লাজমামেমব্রেনের প্রধান কাজ কী?
১২। ক্লোরোপ্লাস্টের রং সবুজ হয় কেন?
১৩। মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বলা হয় কেন?
১৪। মাইটোকন্ড্রিয়াকে অর্ধ-স্বনির্ভর অঙ্গাণু বলা হয় কেন?
১৫। কোন অঙ্গাণুকে কোষের প্রোটিন তৈরির কারখানা বলা হয়?
১৬। নিউক্লিক এসিডকে মাস্টার মলিকিউল বলা হয় কেন?
১৭। DNA-কে বশগতির ধারক ও বাহক বলা হয় কেন?
১৮। নিউক্লিওসাইড বলতে কী বুঝ?
১৯। জেনেটিক কোডের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
২০। লাইসোজোমকে আত্মঘাতি বলা হয় কেন?
২১। রাইবোজোমকে সার্বজনীন অঙ্গাণু বলা হয় কেন?
২২। জেনেটিক কোডকে ট্রিপলেট কোড বলা হয় কেন?
২৩। ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝ?
২৪। ট্রান্সক্রিপশন বলতে কী বুঝ?
২৫। অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুলিপন কিভাবে হয়?
২৬। সূচনা কোডন বলতে কী বুঝ?
২৭। ক্লোরোপ্লাস্টের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর?
২৮। লিউকোপ্লাস্টকে বর্ণহীন অঙ্গাণু বলা হয় কেন?
২৯। ফুলের পাপড়ির নানা ধরনের রং হয় কেন?
৩০। সমাপনী কোডন বলতে কী বুঝ?
৩১। লিউকোপ্লাস্ট উদ্ভিদের কোথায় পাওয়া যায়?
৩২। ক্লোরোপ্রাস্টকে অর্ধ-স্বনির্ভর অঙ্গাণু বলা হয় কেন?
৩৩। উদ্ভিদের মূল বর্ণহীন হয় কেন?
৩৪। কোষ বিভাজনে ক্রমোজোমের ভূমিকা লিখ?
৩৫। RNA-এর রাসায়নিক গঠন লিখ?
৩৬। DNA–এর রাসায়নিক গঠন লিখ?
৩৭। tRNA-বলতে কী বুঝ?
৩৮। ট্রান্সক্রিপশন বলতে কী বুঝ?
৩৯। ট্রান্সলেশন বলতে কী বুঝ?
৪০। জেনেটিক কোড বলতে কী বুঝ?
৪১। জেনেটিক কোডকে দ্ব্যর্থহীন বলা হয় কেন?
৪২। কোষকে জীবদেহের গঠন ও কাজের একক বলা হয় কেন?
৪৩। প্রোটোপ্লাজমকে ,জীবনের ভৌত ভিত্তি, বলা হয় কেন?
৪৪। রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় কেন?
৪৫। আত্মঘাতী অঙ্গাণু কী? ব্যাখ্যা কর।
৪৬। নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাসের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর?
৪৭। Clover leaf Model বলতে কী বুঝায়?
৪৮। নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইড বলতে কী বুঝ?
৪৯। ট্রিপলেট কোডন বলতে কী বুঝ?
৫০। নিউক্লিয়াসকে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন?
৫১। ক্রোমোজোমকে বংশগতির ধারক বলা হয় কেন?
৫২। mRNA-চূড়ান্তকরণ বলতে কী বুঝ?
৫৩। অর্ধ-সংরক্ষণ অনুলিপন কীভাবে হয়?
৫৪। নিউক্লিয়াসের উপস্থিতিতে কোষ কত প্রকার ও কী কী?
৫৫। আদিকোষ ও প্রকৃতকোষে রাইবোজোমের প্রকৃতি কী ধরনের?
৫৬। প্লাজমোডেসমাটা বলতে কী বুঝ?
৫৭। পিনোসাইটোসিস বলতে কী বুঝায়?
৫৮। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের কাজ লিখ?
৫৯। কোষস্থ নির্জীব বস্তু বলতে কী বুঝ?
৬০। জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্য লিখ?
৬১। ট্রিপলেট কোডন বলতে কী বুঝায়?
৬২। ক্রসিংওভার কীভাবে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে?
৬৩। নিউক্লিয়ার এনভেলাপ বলতে কী বুঝায়?
৬৪। সাইক্লোসিস বলতে কী বুঝায়?
৬৫। ডিএনএ-কে ক্রোমাটিন পদার্থ বলা হয় কেন?
৬৬। অ্যামাইলোপ্লাস্ট বলতে কী বুঝায়?
৬৭। জিনের এক্সপ্রেশন বলতে কী বুঝায়?
৬৮। অটোজোম বলতে কী বুঝায়?
৬৯। কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা লিখ?
৭০। কোষের সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলোর নাম উল্লেখ কর?
৭১। পিউরিন ও পাইরিমিডিন বলতে কী বুঝায়?
৭২। উদ্ভিদকোষের ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীর গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৭৩। সেন্টিওলের কাজ উল্লেখ কর?
৭৪। থাইলাকয়েড বলতে কী বুঝায়?
৭৫। অপেরন বলতে কী বুঝ?
৭৬। লিথাল জিন বলতে কী বুঝ?
৭৭। DNA কীভাবে কাজ করে?
৭৮। জেনেটিক কোডকে ট্রিপলেট কোড বলা হয় কেন?

তুলনা কর :

৭৯। উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ।
৮০। আদিকোষ ও প্রকৃতকোষ।
৮১। দেহকোষ ও জননকোষ।
৮২। কোষপ্রাচীর ও কোষঝিল্লী।
৮৩। প্রোটোপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজম।
৮৪। লিউকোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্ট।
৮৫। mRNA ও tRNA।
৮৬। DNA ও RNA।
৮৭। সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিওপ্লাজম।
৮৮। ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন।
৮৯। মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট।
৯০। হেটারোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন।

১। রবিন, কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু পড়ার সময় দেখল দ্বিস্তরবিশিষ্ট দুটি কোষীয় অঙ্গাণু একটি শক্তিঘর নামে ও অপরটি কোষের ট্রাফিক পুলিশ। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৯]*

(ক) অটোফ্যাগী কী? ১
(খ) রাইবোসোমকে সর্বজনীন অঙ্গাণু বলা হয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের ২য় অঙ্গাণুটির গঠন চিত্রসহ লিখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের ১ম অঙ্গাণুটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের চিত্র লক্ষ্য করে প্রশ্নের উত্তর দাও *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]*

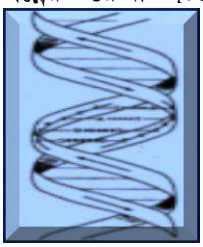

(ক) প্লাসমোডেসমাটা কী? ১
(খ) *E. coli* একটি আদিকোষী অণুজীব- ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে প্রদর্শিত অণূটি থেকে কীভাবে নতুন অণু সৃষ্টি হয়, বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের প্রদর্শিত অণুটির গঠনগত পরিবর্তন করে তা মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যায়- বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*

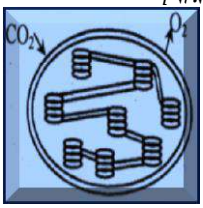

(ক) সংকরায়ন কী? ১
(খ) শস্য বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের অঙ্গাণুটির গঠন বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪।

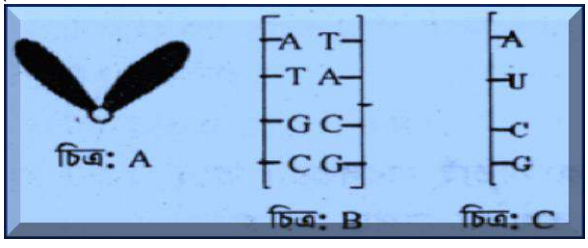

(ক) সিস্ট্রন কী? ১
(খ) পরিবাহক RNA বা tRNA বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) চিত্র-A এর ভৌত গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) চিত্র B-এর জেনিটিক কোড চিত্র C-তে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। উদ্ভিদে একটি কোষীয় অঙ্গাণু শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সেই খাদ্য একটি জৈবনিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয়।

(ক) নিউক্লিক এসিড কী? ১
(খ) জেনেটিক কোড বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের অঙ্গাণুটির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর? ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রক্রিয়া দুটির মধ্যে তুলনা করা? ৪

৬। স্টাচবার্জার সর্বপ্রথম ১৮৭৫ সালে কোষস্তিত একটি অঙ্গাণু আবিস্কার করেন যা স্বকীয় গঠন ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভাজনে সক্ষম ও বংশাণুক্রমে অপরিবর্তনশীল।

(ক) ডেসমোজোম কী? ১
(খ) মাইটোকন্ড্রিয়াকে অর্ধ-স্বনির্ভর অঙ্গাণু বলা হয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত অঙ্গাণুটির ভৌত গঠন ব্যাখ্য? ৩
(ঘ) কোষ বিভাজনে উক্ত অঙ্গাণুটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করো? ৪

৭। এক ছাত্রী বিজ্ঞান মেলায় গিয়ে ছেলেমেয়েদের তৈরি নুতুন নুতুন উদ্ভাবন দেখে অবাক হলো। এমন সময়ে একটি Project-এ দেখল, প্যাঁচানো লোহার সিড়ির মতো একটি গঠন। সে এ সম্বন্ধে জানতে চাইলে, Project-এ অংশগ্রহণকারী কিছু ছাত্রী এই গঠনটি DNA-এর গঠন বলে তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিল। এতে তার বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আরো নিবিড় হলো।

(ক) পাইরিমিডিন কী? ১
(খ) নিউক্লিওটাইড বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উল্লেখিত লোহার সিড়ির মতো গঠনটির রাসায়নিক গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের লোহার সিড়ির মতো গঠনটি DNA-এর গঠন-তোমার যুক্তিকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার অঙ্গাণুর এক বিশাল সমাহার। এদের মধ্যে এক প্রকার অঙ্গাণু খাদ্য তৈরি করে এবং অন্য প্রকার অঙ্গাণু স্নেহ বিপাকে ভূমিকা রাখে ও শক্তি উৎপাদন করে থাকে।

(ক) ক্রোমোপ্লাস্ট কী? ১
(খ) জেনেটিক কোডের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? ২
(গ) উদ্দীপকের ১ম অঙ্গাণুর চিহ্নিত চিত্র আঁক। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের ১ম ও ২য় অঙ্গাণুর তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৯। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নেগুলোর উত্তর দাও :

[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]

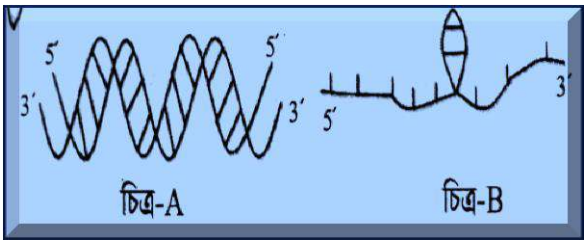

(ক) সোরাস কী? ১
(খ) উগ্যামাস প্রকৃতির জনন বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের A ও B এর মধ্য পার্থক্য লিখ। ৩
(ঘ) জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে A ও B এর ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। A ও B দুটি জৈব অণু। A নিজেই তার প্রতিরুপ তৈরি করতে পারলেও B তার প্রতিরুপ তৈরি করতে পারে না। A-এর সহযোগিতায় B তৈরি হয়।

(ক) কোলেস্টেরল কী? ১
(খ) দেহকোষ ও জনন কোষের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ? ২
(গ) A-এর রাসায়নিক গঠন ব্যাখ্যা কর? ৩
(ঘ) A-এর সহযোগিতায় B তৈরি হয়- বিশ্লেষণ কর? ৪

১১। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. মনজুর হোসেন শ্রেণিকক্ষে কোষ ও এর গঠন পড়ানোর সময় বললেন, উদ্ভিদকোষে A ও B দুটি আবরণ আছে। A আবরণটি মৃত এবং B আবরণটি সজীব।

(ক) একক পর্দা কী? ১

(খ) কোষ প্রাচীরের কাজ কী? ২

(গ) উদ্দীপকের B আবরণটির সর্বজনগ্রাহ্য একটি মডেলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের A ও B আবরণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১২। উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে একটি অঙ্গাণু আছে যাকে শক্তি ঘর (Power House) বলা হয়। অবার সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বায়ু ও পানির সাহায্যে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে এমন একটি অঙ্গাণু যা প্রাণিকোষের নেই কিন্তু সাধারণত সবুজ উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়।

(ক) নিউক্লিক এসিড কী? ১

(খ) কোষকে সজীব বস্তু বলা হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের যে অঙ্গাণুটি শুধু উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় তার অন্তর্গঠন লিখ। ৩

(ঘ) যে অঙ্গাণুটি উভয় কোষে পাওয়া যায় তার নাম লিখ এবং কেন তাকে শক্তি ঘর বলা হয় বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩।

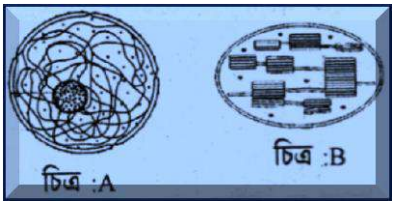

(ক) অটোজোমাল জিন কী? ১

(খ) বিরাম কোডন বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) চিত্র B-কে উদ্ভিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ অঙ্গাণু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর? ৩

(ঘ) বংশানুক্রমে চিত্র-A গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে- বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪। জীবকোষে দুই ধরনের জৈব এসিড থাকে, যার একটি দ্বিসূত্রক অবস্থায় বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করলেও অপরটি একসূত্রক এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৮]*

(ক) সেন্ট্রোস্ফিয়ার কী? ১

(খ) জেনেটিক কোড বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকের প্রথম জৈব এসিডটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উপরোক্ত দুই ধরনের এসিডের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১৫। অ্যামিনো গ্রুপ বিশিষ্ট জৈব এসিডের অণু শৃঙ্খলিত হয়ে একটি জৈব পদার্থ তৈরি করে। জীবদেহে পদার্থটির সংশ্লেষণে বিভিন্ন নিউক্লিক এসিড জড়িত।

(ক) নিউক্লিওলাস কী? ১

(খ) ফুলের পাপড়ি নানা রংয়ের হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের জৈব পদার্থটি তৈরি হওয়ার বন্ধন দেখাও। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬। জামান শখের বশত একটি ফুলের বাগান করে। প্রতিদিন বাগানের ফুলগাছের পরিচর্যা করার সময় গাছের কান্ড, পাতা, ফুল ও ফলের মধ্যে রংয়ের বিভিন্নতা লক্ষ্য করল। অপরদিকে কয়েকটি গাছের বীজ থেকে নুতুন কিছু চারা তৈরি করেছিল যাতে গাছগুলোর পূর্বপুরুষের রং, গঠন ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অনেক মিল ছিল।

(ক) আদি কোষ কী? ১

(খ) ট্রান্সলেশন বলতে কী বুঝ? ২

(গ) জামান প্রথমে যা লক্ষ্য করল তার জন্য দায়ী অঙ্গাণুটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) পূর্বপুরুষের সকল বৈশিষ্ট্যগুলো যে অঙ্গাণুর মাধ্যমে পরিবাহিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তার জৈব-রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করে প্রশ্নোগুলোর উত্তর দাও :

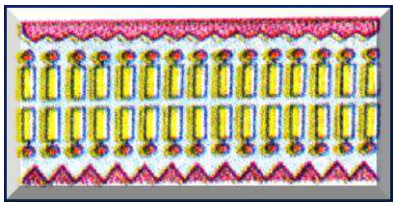

(ক) প্লাজমামেমব্রন কী? ১

(খ) কোষপ্রাচীর ও কোষঝিল্লীর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত চিত্রটির সর্বাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী গঠন বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত গঠনটির জৈবনিক কাজ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮। একজন শিক্ষক ফুলবাগান থেকে গবেষণার জন্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এসে খুব আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, ফুল গাছের পাতা সবুজ কিন্তু পাপড়িগুলো লাল হয় কেনো? তখন শিক্ষক তাদের খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, বিশেষ একটি বর্ণ কণিকা খুব বেশি পরিমাণে থাকার কারণে ফুলগাছের পাতা এত সবুজ হয়, যাহা উদ্ভিদ তথা জীবজগতের জন্য অপরিহার্য।

(ক) ক্লোরোপ্লাস্ট কী? ১

(খ) সেন্ট্রোমিয়ার বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উক্ত অঙ্গাণুটির অন্তর্গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উক্ত অঙ্গাণুটি জীবজগতের জন্য একান্ত অপরিহার্য- বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯। ড. কামাল শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় দুটো কোষ অঙ্গাণু সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা দেন। যার প্রথমটি না থাকলে কোষটিতে সবাত শ্বসন সম্ভব হয় না এবং অপরটির অনুপস্থিতির কারণে পরজীবী হয়।

(ক) ক্রোমোজোমের স্যাটেলাইট কী? ১

(খ) ট্রান্সফরমেশন বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকের প্রথম অঙ্গাণুটির কর্মপরিধি লিখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত দ্বিতীয় অঙ্গাণুটির খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২০। শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে জীবদেহের গঠনের দুই আবরণী যুক্ত একটি আদর্শ এককের চিহ্নিত চিত্র আঁকলেন যার বাইরের আবরণটি নির্জীব এবং ভেতরের আবরণটি সজীব। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]*

(ক) ব্যাকটেরিওফায কী? ১

(খ) লাইকেন বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকের গঠনের একটির চিহ্নিত চিত্র আঁক। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আববরণ দুটির মধ্যে তুলনা কর। ৪

১। কোনটি DNA বহনকারী অঙ্গাণু? *[ঢা. বো. '১৯]*
(ক) গলজিবস্তু (খ) লাইসোসোম
(গ) রাইবোসোম (ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়া

২। RNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে? *[ঢা.বো. '১৭]*
(ক) রেপ্লিকেশন (খ) ট্রান্সলেশন
(গ) ট্রান্সক্রিপসন (ঘ) ট্রান্সফরমেশন

৩। লিউকোপ্লাস্ট- *[কু. বো. '১৭]*
i. ভনিম্নস্থ কাণ্ডে অবস্থান করে
ii. আলোতে সবুজ বর্ণ ধারণ করে
iii. ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল সমৃদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

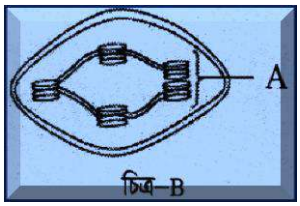

চিত্র–B

চিত্রের A-চিহ্নিত অংশটির নাম কী? *[ঢা. বো. '১৬]*
(ক) ল্যামেলাম (খ) গ্রানাম
(গ) স্ট্রোমা (ঘ) ক্রিস্টি

৫। B-এর কাজ হলো- *[ঢা. বো. '১৬]*
i. শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা
ii. ফটোফসফোরাইলেশন করা
iii. ফটোরেসপিরেশন সংঘটন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

৬। প্রাথমিক কোষ প্রাচীর তৈরিরতে ব্যবহৃত হয়-
i. সেলুলোজ
ii. পলিস্যাকারাইড
iii. পেকটিন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

৭। কোষের অভ্যন্তরে pH রক্ষা করে কোনটি? *[ঢা. বো. '১৭]*
(ক) সাইটোপ্লাজম (খ) কোষ গহ্বর
(গ) গ্লাইঅক্সিজোম (ঘ) নিউক্লিওপ্লাজম

৮। কোন পরিবেশের কোষ স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারে?
(ক) নিম্ন তাপমাত্রায় (খ) অনুকূল পরিবেশে
(গ) প্রতিকূল পরিবেশে (ঘ) উচ্চ তাপমাত্রায়

৯। প্রোটোপ্লাজমের নিউক্লিয়াসবেষ্টিত ও কোষঝিল্লি দ্বারা আবৃত অংশকে কী বলে?
(ক) লাইসোজোম (খ) মাইটোকন্ড্রিয়া
(গ) রাইবোজোম (ঘ) সাইটোপ্লাজম

১০। 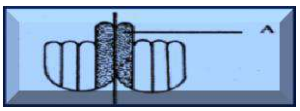 *[সি. বো. '১৬]*
উপরের চিত্র A-চিহ্নিত অংশটি হলো-
(ক) মধ্যপর্দা (খ) প্রাইমারি প্রাচীর
(গ) সেকেন্ডারি প্রাচীর (ঘ) প্লাজমোডেসমা

১১। নিচের কোন গঠনটি সাইটোপ্লাজমের নয়? *[সি. বো. '১৫]*
(ক) গলজি বস্তু (খ) রাইবোজোম
(গ) ক্রোমাটিন তন্তু (ঘ) এন্ডোপ্লজামিক রেটিকুলাম

১২। ক্রেবস চক্র কোষের কোন অঙ্গাণুতে সম্পন্ন হয়? *[ঢা. বো. '১৬]*
(ক) মাইটোকন্ড্রিয়াতে (খ) নিউক্লিয়াসে
(গ) গলজি বস্তুতে (ঘ) রাইবোজোমে

১৩। অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন সংঘটিত হয়- *[য. বো. '১৬]*
(ক) সাইটোপ্লাজমে (খ) রাইবোজোমে
(গ) ক্লোরোপ্লাস্টে (ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়নে

১৪। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে দানাদার বস্তু কোনটি? *[রা. বো. '১৬]*
(ক) জিন (খ) ভেসিকল
(গ) লাইসোজোম (ঘ) রাইবোজোম

১৫। কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি কোনটি? *[চ. বো. '১৬]*
(ক) গলজি বস্তু (খ) রাইবোজোম
(গ) লাইসোজোম (ঘ) এন্ডোপ্লাজামিক রেটিকুলাম

১৬। কোষীয় কোন অঙ্গাণু বংশগতির উপাদান বহন করে? *[রা.বো. '১৫]*
(ক) লাইসোজোম (খ) ক্রোমোসোম
(গ) রাইবোজোম (ঘ) ডিকটায়োজোম

১৭। মানুষের কত জোড়া অটোসোম থাকে?
(ক) ৪৬ (খ) ২৩
(গ) ৪৪ (ঘ) ২২

১৮। RNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে নিচের কোনটি বিদ্যমান থাকবে? *[য. বো. '১৬]*
(ক) ইউরাসিল (খ) অ্যাডেনিন
(গ) গুয়ানিন (ঘ) সাইটোসিন

১৯। নিচের কোনটি Serene (Ser) এমাইনো এসিডকে চিহ্নত করে? *[সকল বোর্ড - ২০১৮]*
(ক) UCC (খ) AAA
(গ) CUU (ঘ) UAG

২০। কোষের শক্তি উৎপাদনকারী অঙ্গাণু কোনটি? *[সি. বো. '১৭]*
(ক) ক্লোরোপ্লাস্ট (খ) রাইরোজোম
(গ) মাইটোকন্ড্রিয়া (ঘ) গলজি বস্তু

২১। কোষ বিভাজনের সময় কোষপ্লেট তৈরিতে সাহায্য করে কোন অঙ্গাণু? *[দি. বো. '১৭]*
(ক) গলজি বস্তু (খ) রাইবোজোম
(গ) মাইক্রোটিউলস (ঘ) লাইসোজোম

২২। নিউক্লিয়াসের উপাদান কোনটি? *[ঢা. বো. '১৬]*
(ক) ক্রোমোজোম (খ) লাইসোজোম
(গ) রাইবোজোম (ঘ) সেন্ট্রোজোম

২৩। RNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে নিচের কোনটি বিদ্যমান থাকবে? *[য. বো. '১৬]*
(ক) ইউরাসিল (খ) এডিনিন
(গ) গুয়ানিন (ঘ) সাইটোসিস

২৪। শক্তি রূপান্তরের সাথে জড়িত অঙ্গাণু কোনটি? *[কু. বো. '১৬]*
(ক) রাইবোজোম (খ) ক্লোরোপ্লাস্ট
(গ) লাইসোজোম (ঘ) গলজি বডি

২৫। জিনের যে কার্যকরী একক পলিপেপটাইট সংশ্লেষণ করে তাকে কী বলে? *[সি. বো. '১৬]*
(ক) কোডন (খ) সিস্ট্রেন
(গ) মিউটন (ঘ) রেকন

২৬। কোষীয় কোন অঙ্গাণু বংশগতির উপাদান বহন করে? *[রা. বো. '১৫]*
(ক) লাইসোজোম (খ) ক্রোমোজোম
(গ) রাইবোজোম (ঘ) ডিকটায়োজোম

২৭। কোনটি শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু? *[য. বো. '১৯]*
(ক) মাইটোকন্ড্রিয়া (খ) ক্লোরোপ্লাস্ট
(গ) লাইসোজোম (ঘ) রাইবোজোম

২৮। কোনটি সঠিক? *[ব. বো. '১৫]*
(ক) আদিকোষী = ডিম্বাণু
(খ) লিফরোল = ব্যাকটেরিয়া
(গ) অ্যাপ্লানোস্পোর = সচল কোষ
(ঘ) উওকিনেট = ডিপ্লেয়েড

২৯। নিচের কোন গঠনটি সাইটোপ্লাজমের নয়? *[সি. বো. '১৫]*
(ক) গলজি বডি (খ) রাইবোজোম
(গ) ক্রোমাটিন তন্তু (ঘ) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

৩০। নিচের কোনটি সূচনা কোডন? *[দি. বো. '১৫]*
(ক) AUG (খ) UAG
(গ) UGA (ঘ) UAA

৩১। m-RNA সৃষ্টি করতে ব্যবহার হয়-
i. RNA পলিমারেজ
ii. DNA পলিমারেজ
iii. N_2 ক্ষার AUGC
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

৩২। কোষপ্লেট গঠনের উপাদানগুলো হলো-
i. ফ্রাগমোপ্লাস্ট
ii. ফ্রুক্টোজ
iii. পেকটিন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

৩৩। কোষীয় পরিপাকে অংশগ্রহণকারী অঙ্গাণু কোনটি?
(ক) রাইবোজোম (খ) লাইসোজোম
(গ) মাইটোকন্ড্রিয়া (ঘ) গলজি বস্তু

৩৪। DNA ধারণকারী কোষীয় অঙ্গাণু- *[কু. বো. '১৬]*
i. ক্লোরোপ্লাস্ট
ii. মাইটোকন্ডিয়া
iii. রাইবোজোম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

৩৫। মিউটন কী? *[মেডিকেল : '১৬-১৭]*
(ক) জিন প্রকাশের একক (খ) জিন কার্যের একক
(গ) জিন রিকম্বিনেশনের একক (ঘ) জিন মিউটেশনের একক

📖 নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
লনের সবুজ ঘাস কিছুদিন ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকায় ঘাসগুলো বর্ণহীন হয়ে গেল।

৩৬। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘাসগুলো বর্ণহীন হওয়ার কারণ কী?
(ক) সব ধরনের প্লাস্টিড নষ্ট হয়ে যাওয়া *[দি. বো. '১৬]*
(খ) ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হওয়া
(গ) ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে পরিণত হওয়া
(ঘ) লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে পরিণত হওয়া

৩৭। উদ্দীপকের বর্ণিত বর্ণহীন ঘাসগুলো কিছু দিন সূর্যালোকের সংস্পর্শে থাকলে, কী ঘটবে- *[দি. বো. '১৬]*
i. লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হবে
ii. ঘাসগুলো বর্ণহীন থেকে যাবে
iii. ঘাসগুলো ক্রমান্বয়ে সবুজ বর্ণ ধারণ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

📖 নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দা :
উদ্ভিদকোষে একটি অঙ্গাণু থাকে যা জীবকুলের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সবুজ রঙের জন্য দায়ী।

৩৮। উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাণুটি- *[দি. বো. '১৫]*
i. সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে
ii. বয়স্ক পাতায় কম পরিমাণে থাকে
iii. শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

৩৯। ডি-অক্সিরাইবোজের কয় নম্বর কার্বনে অক্সিজেন নেই?
(ক) ২ নং- এ (খ) ৩ নং-এ
(গ) ৪ নং-এ (ঘ) ৫ নং-এ

📖 উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিমের দেহের সকল কোষে এমন একটি উপাদান আছে যা বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাহ করে এবং জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে।

৪০। উদ্দীপকের উপাদানটিতে নাইট্রোজিনাস বেসগুলো কীভাবে সজ্জিত থাকে?
(ক) A = T, G ≡ C (খ) A = T, C - G (গ) A = G, C = T (ঘ) C = T, A = G.

৪১। যেটি প্লাজমামেমব্রেন এর কাজ নয়- *[ডেন্টাল : ০২-০৩]*
(ক) ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণে সহায়তা করে
(খ) কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব নিয়ন্ত্রণ করে
(গ) বিশেষ বিশেষ এনজাইম বিন্যস্ত থাকার জন্য কাঠামো তৈরি করা
(ঘ) বিভিন্ন বৃহদাণু সংশ্লেষ করে

৪২। নিম্নের কোন অঙ্গাণুতে DNA থাকে?
(ক) গলজি বডি (খ) নিউক্লিওলাস
(গ) মাইটোকন্ড্রিয়া (ঘ) রাইবোজোম

📖 উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

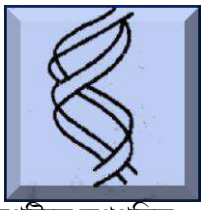

৪৩। চিত্রে প্রদর্শিত অণুটিতে অণুপস্থিত *[রা. বো. '১৭]*
(ক) অ্যাডিনিন (খ) গুয়ানিন
(গ) সাইটোসিন (ঘ) ইউরাসিল

৪৪। প্রদর্শিত অণুটি একসূত্রক বিশিষ্ট্য হলে এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য - *[রা. বো. '১৭]*
i. ক্ষারকে
ii. বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে
iii. স্যুগারে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

📖 চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

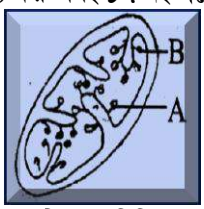

৪৫। উপরের অঙ্গাণুটির A চিহ্নিত অংশের নাম কী? *[রা. বো. '১৬]*
(ক) স্ট্রোমা (খ) ক্রিস্টি
(গ) অক্সিজোম (ঘ) মাতৃকা

৪৬। কোনটি গলজি বডির নাম নয়? *[মেডিকেল : '১৩-১৪]*
(ক) ডিকটিওসোম (খ) ইডিওসোম
(গ) ইস্ট (ঘ) অ্যানজিওস্পার্ম

৪৭। নিম্নের কোন কোষাঙ্গে DNA থাকে? *[মেডিকেল : '১১-১২]*
(ক) গলগিবস্তু (খ) নিউক্লিওলাই
(গ) মাইটোকন্ড্রিয়া (ঘ) রাইবোসোম

৪৮। একটি মনোনিউক্লিওটাইডের দৈর্ঘ্য- *[মেডিকেল : '০২-০৩]*
(ক) ৩৪ A (খ) ১০ A
(গ) ৩.৪ A (ঘ) ০.৩৪ A

৪৯। ফ্লুইড মোজাইক মডেল অনুযায়ী সেল মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদান নয়- *[মেডিকেল : '০৩-০৪]*
(ক) স্টার্চ (খ) কোলেস্টেরল
(গ) সেন্টোসোম (ঘ) মেমব্রেন প্রোটিন

৫০। উদ্ভিদ কোষে থাকে না- *[মেডিকেল : '৯২-৯৩]*
(ক) প্লাস্টিড (খ) কোষ প্রাচীর
(গ) সেন্ট্রোসোম (ঘ) সঞ্চিত খাদ্য শ্বেতসার

৫১। কোন ক্ষুদ্রাঙ্গটি প্রানী কোষে থাকে না? *[মেডিকেল : '৮৯-৯০]*
(ক) রাইবোসোম (খ) মাইটোকন্ড্রিয়া
(গ) প্লস্টিড (ঘ) গলগি বস্তু

৫২। ক্রোমোসোমে DNA ও হিস্টোনের পরিমাণ যথাক্রমে *[মেডিকেল : '০৩-০৪]*
(ক) ৩৫% - ৫৫% (খ) ৪৫% - ৫০%
(গ) ৫০% - ৪০% (ঘ) ২৫% - ৬৫%

৫৩। DNA-তে যে নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারটি বিদ্যামান থাকে? *[মেডিকেল : '৯৯-০০]*
(ক) মিথিওনিন (খ) সাইটোসিন
(গ) হিসটিডিন (ঘ) আরজিনন

৫৪। আলু গাছের দেহে ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোমের সংখ্যা- *[মেডিকেল : '৯৪-৯৫]*
(ক) ১৮ (খ) ৩৬
(গ) ২৪ (ঘ) ৪৮

৫৫। নিম্নের কোনটি DNA-এর বৈশিষ্ট্য নয়?*[ডেন্টাল : '০৭-০৮]*
(ক) কোষের সর্বত্র কিস্তৃত থাকে
(খ) সবসময় ডাবল হেলিক্স
(গ) চিরস্থায়ী
(ঘ) সকল ক্ষেত্রে বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে

📖 সঠিক উত্তর : অনুশীলনী-১ 📖

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ঘ	খ	ক	খ	ঘ	গ	ক	খ	ঘ	খ	গ	ক	ঘ	ঘ	খ	খ	ঘ	ক	ক	গ
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
ক	ক	ক	খ	খ	খ	খ	ঘ	গ	ক	খ	গ	খ	ক	ঘ	খ	গ	ক	ক	খ
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	*	*	*	*	*
খ	গ	ঘ	ঘ	খ	ঘ	গ	গ	ক	গ	গ	ক	খ	ঘ	ক	*	*	*	*	*